ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা

কেশবসুত

প্রভাকর মাচরে

অনুবাদ
ক্ষিতীশ রায়

সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

সূচী

ভূমিকা

মারাঠী কবিতা যাঁরা ভালবাসেন কেশবসুতের নাম শুনলে তাঁদের মনে যে কি রকম ভাবের উদয় হয় তা হয়তো অনেকখানি স্পষ্ট হবে এই বললে যে, উর্দুভাষীর কাছে হালী যেমন, বাঙালীর কাছে যেমন মধুসূদন দত্ত, তামিল ভাষীর কাছে যেমন সুব্রহ্মণ্য ভারতী বা গুজরাটীর কাছে নর্মদ, তেমনি হলেন কেশবসুত মারাঠীদের কাছে। নিজ নিজ ভাষায় এই সব প্রখ্যাত কবি আধুনিক কবিতার অগ্রদূত বলে স্বীকৃত। এঁদের মতো কেশবসুত মারাঠী কবিতায় কেবল যে মধুর রসের সঞ্চার করেছিলেন এমন নয়, কেবল কাব্যের ভাষা বা শৈলীতে নতুন নতুন ক্ষেত্র রচনা করেছিলেন এমনও নয়, পরন্তু পরম্পরাগত কাব্যের আদর্শকে নতুন পথে চালনা করার দুরূহ কর্তব্যে অগ্রণী হয়েছিলেন। উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশে যে জাতীয় জাগরণের সূচনা হয়েছিল, এই সব মহান কবিরা সেই যুগের ভারতীয় সাহিত্যে তাঁদের কালজয়ী স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

কবিতার ইতিহাসে এমন অনেক শ্রেষ্ঠ কবির নাম পাওয়া যায়, যাঁরা আজীবন অজ্ঞাত ও উপেক্ষিত থেকে গেছেন, যাঁদের বিষয়ে লোকে খুব সামান্যই জানে। কালিদাসের কাল কবে যে ছিল তা এখনও নিরূপিত হয়নি, ওমর খৈয়মের তাবৎ রুবাই আজও আবিষ্কৃত হয়নি, হোমার যে কোথায় জন্মেছিলেন তা নিয়ে সাত-আটটি নগরীর মধ্যে ঝগড়া এখনও মেটে নি। কেশবসুত যদিও একালের কবি, তাঁর জন্মদিন নিয়েও নানা মত দেখা যায়। তাঁর বিষয়ে নিশ্চিত করে যতটুকু বলা চলে তা হল এই যে, তাঁর রচিত ১৩২টি কবিতার একটি ছোট বই তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। পরলোকগতা কুসুমাবতী দেশপাণ্ডে তাঁর "মারাঠী সাহিত্যের ইতিহাস"* গ্রন্থে কেশবসুতের কবিকৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে যা বলে গেছেন, তা থেকে একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে :

"হরিনারায়ণ আপটে মারাঠী উপন্যাসের ক্ষেত্রে যে-কীর্তি রেখে গেছেন, মারাঠী কবিতার ক্ষেত্রে কেশবসুতের দান তুল্যমূল্য বলা যেতে পারে। এঁরা উভয়ে সৃজনধর্মী সাহিত্য রচনা করে গেছেন। দেশী ও বিদেশী প্রাচীন ধারার কবিতার দ্বারা প্রভাবিত মারাঠী কাব্যসাহিত্যে কেশবসুত

* এ-বই অকাদেমী অচিরে প্রকাশ করবেন।

যে নতুন সুরের আমদানী করলেন, সে তাঁর নিজস্ব সুর। অনুকৃত প্রতিধ্বনির মধ্যে তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠ স্বকীয়তায় স্পষ্ট। একটা সময় ছিল যখন তাঁকেও ঐতিহ্যের অভ্যস্ত পথে চলতে হয়েছে। কিন্তু আত্মপ্রকাশের সাচ্চা সুর যখন তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হল, তিনি মারাঠী কবিতার নতুন যুগের আবাহন করলেন।

"প্রথম বয়সে লেখা কেশবসুতের কবিতার সন্ধান পাওয়া যায় না। শোনা যায় বালক বয়স থেকেই প্রচলিত ছন্দে প্রকৃতির বর্ণনা কিংবা নীতি-মূলক কবিতা রচনায় তাঁর বেশ ভাল দখল ছিল। তাঁর যে-সব কবিতা পাওয়া গেছে তার মধ্যে সর্বপ্রথম হল 'রঘুবংশ' থেকে একটি অংশবিশেষের অনুবাদ। এটির রচনা তারিখ ছিল ১৮৮৫। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে যাকে শৃংগার রস বলে, তাঁর প্রথম যুগের রচিত প্রেমের কবিতায় তার প্রাধান্য দেখা যায়। ভাষাশৈলী ও চিত্রকল্পে সংস্কৃত কাব্য ও সংস্কৃত কাব্য-দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত প্রচলিত মারাঠী কাব্য থেকে তিনি প্রেরণা পেয়েছিলেন। সংস্কৃতের ধ্বনিগাম্ভীর্য ও বিচিত্র ছন্দোবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতায় লক্ষিত হয়েছিল একটা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবানুগ ভাব...। পরবর্তী যুগে অবশ্য ভাষার ব্যবহারে তিনি দৈনন্দিন চলিত কথার আশ্রয় নিতে দ্বিধা করেন নি। গোঁড়া প্রাচীনপন্থীরা যে-সব কথাকে কাব্যের অনুপযোগী ও শ্রুতিকটু বলেছেন, তেমন কথাও তিনি সাহস করে তাঁর কবিতায় স্থান দিয়েছেন। ইংরেজি 'ওড্'-এর অনুসরণে ভাবে ও ভাষায় অবিচ্ছিন্ন, দৃঢ়বন্ধ দীর্ঘ কবিতা রচনা করে, কেশবসুত মারাঠী শ্লোক-জাতীয় কবিতায় নতুন শক্তির সঞ্চার করেছিলেন। পরবর্তী যুগে তাঁর কবিতার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে-পরিবর্তন এসেছিল, সে হল কবিতায় তাঁর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অথবা নিছক আত্মপ্রকাশের উচ্ছ্বাস।...পরিণত বয়সে তার কবিকল্পনায় একটি নতুন প্রত্যয়, কাব্যের তাৎপর্য বিষয়ে একটি গভীর বিশ্বাস এবং আত্মপ্রকাশের একটি অসাধারণ আন্তরিকতা দেখা যায়। তাঁর কবিজীবনের এই বিবর্তনের সঙ্গে জন্ম নিয়েছিল সাম্প্রতিক মারাঠী সাহিত্যের নতুন গীতিকবিতা।'

"অনেক অংশে কেশবসুতের কবিজীবনে এই পরিবর্তন এসেছিল ইংরেজি কাব্যের প্রভাবে। কুণ্টে, মহাজনী ও অন্যান্য কবিরা অনুবাদের মধ্য দিয়ে মারাঠী কবিতায় এই নতুন প্রবাহ এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু এ ছিল যেন বন্যার জল, মাটির গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। অনুবাদ বা নিছক অনুকরণের স্তরে এই প্রভাব ছিল আবদ্ধ। কেশবসুতও কিছু কিছু ইংরেজি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন...এর মধ্যে কয়েকটি ছিল ভাবানুবাদ

বা রূপান্তর—সোজাসুজি অনুবাদ নয়।...কিন্তু হাতের কাছে যে-সব ইংরেজি কবিতা তিনি পেয়েছিলেন বা পড়েছিলেন, তার ফলে কাব্য বিষয়ে তাঁর ধারণা পাল্টে গিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে তাঁর রচনাশৈলীও।

"'কাব্যরত্নাবলী' ও অন্যান্য তাৎকালিক মাসিকপত্রে প্রকাশিত কেশবসুতের কবিতা পড়লে মনে হয় ঊষর প্রান্তরে একটি যেন অনবদ্য ফুল ফুটে আছে। এই সব কবিতার উৎস হল কেশবসুতের ব্যক্তিমানস। প্রবাসী কবি দেশের কথা ভেবে আকুল হচ্ছেন, বন্ধু হতাশ হয়ে ফিরছেন বন্ধুর বাড়ির দরজা তালাবন্ধ দেখে, প্রেমিক প্রিয়জনবিরহে কাতর হয়েছেন, কবি তাঁর কাব্যের প্রকৃতি নিয়ে বিচার করছেন—এই সব হল তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু। প্রকৃতির কবিতায় কেশবসুত নতুন ভাবের আমদানী করলেন...বললেন পাখির কূজনে, বৃষ্টির সংগীতে যে মাধুর্য আছে, তা-ই হল প্রকৃতির কাব্য। মানুষের ভাষায় এই কাব্যের রসমাধুর্য আনতে পারে এমন কবি জন্মান নি। এ মাধুর্যের ক্ষয় নেই, শেষ নেই। প্রকৃতি-বিষয়ে এই চেতনার মধ্যে তিনি অনায়াসে ডুবে যেতে পারতেন বলে, খুব অল্প কথায় এবং বর্ণনাত্মক না হয়েও কেশবসুত একটা মেজাজ ও আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারতেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার মধ্যে প্রকৃতিপ্রেম ওতপ্রোত হয়ে আছে। ভাষার সরলতায় ও ভাবের গভীরতায় কেশবসুতের কোনো কোনো কবিতা ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

"সম্ভবত আগরকরের প্রভাবে আসার ফলে কেশবসুত সাম্য ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহশীল হন। তিনি অচ্ছুত বালক ও ভুখা মজদুর নিয়ে মর্মস্পর্শী কবিতা লিখেছেন। 'তুতারি' অর্থাৎ 'বিষাণ' তাঁর রচিত শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী কবিতার অন্যতম। এই কবিতায় আচার-বিচারের মূঢ়তা ও অন্ধ কুসংস্কার ত্যাগ করে, প্রগতির পথে এগিয়ে যাবার তূর্যনাদ ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর রচিত 'নয়া সিপাহি' কবিতার মধ্যেও সেই একই উদ্দীপনার সুর।

"কেশবসুতের শ্রেষ্ঠ কবিতার বৈশিষ্ট্য হল তাদের গভীর মননশীলতা। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার রহস্যের মধ্যে তিনি প্রবেশ করার প্রযত্ন করেছেন। তাঁর কবিতায় আছে একটা নিঃসঙ্গতার ভাব ও সেই সঙ্গে অন্তরের আশ্রয় লাভ করার জন্য একটা আকূতি। অবাঙমানসগোচর অজ্ঞাত লোকের প্রতি তাঁর যেন লক্ষ্য। এই শ্রেণীর একটি কবিতা হল 'ঝাপূর্ঝা'। মারাঠী মেয়েরা দ্রুতলয়ে 'ঝিম্মা' নামে একটি দেশী খেলা খেলে। তাদের সেই খেলার ছন্দ ও তদ্‌গত ভাব যেন কাটাছাঁটা অর্থশূন্য এই 'ঝাপূর্ঝা' কথার মধ্যে রূপায়িত হয়েছে। এই কবিতায় কবির সৃষ্টিশীল মন যেন

গ্রহতারকার নাগালের বাইরে, কোনো এক বিশাল বিশ্বে, বিচিত্র অনুভূতির জগতে, নভোবিহার করছে। 'হরপাল শ্রেয়' অর্থাৎ 'হারানো আদর্শ' নামে অন্য এক কবিতায় দেখা যায় কবি যেন এক অচেনা দেশে পথ হারিয়ে ফেলেছেন, তার সৃষ্টিমানসের উপযোগী একটি আশ্রয়ের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ঘুরছেন। ওয়ার্ডস্বার্থ-এর 'ওড্ টু ইনটিমেশনস্ অব্ ইম্মরটিলিটি' কবিতার সঙ্গে এই কবিতার যথেষ্ট মিল থাকলেও এটি যে নিছক অনুকরণ নয় তা অনায়াসেই বলা চলে। কেশবসুতের মননধর্মী কবিতায় পাশ্চাত্য কাব্য বিচারের সঙ্গে যেন ভারতীয় দর্শনচিন্তার একটি সুন্দর সমন্বয় ঘটেছে।"

উনিশ শতকে ভারতের যে নতুন যুগের সূচনা—রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে-যুগের পরিপূর্ণ সার্থকতা আমরা দেখতে পাই, সেই যুগের তিনটি বিভিন্ন ধারা যেন কেশবসুতের কাব্যে মিলিত হয়েছে। এই তিনটি বৈশিষ্ট্য হল : বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে বিশ্বদেবতাকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াস, বিদেশী শাসন থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এবং সর্বপ্রকার সামাজিক অন্যায়ের শৃংখল চূর্ণ করে মানুষকে তার আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আবেগ। এই তিন দফা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কেশবসুত কাব্যকে শিক্ষা কিংবা নীতির বাহনরূপে ব্যবহার করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নি। উপনিষদ ও কালিদাসের কাব্যে যে ভাবধারার সূচনা, যে ভাব-সমুদ্রের ধ্রুবতারা ছিলেন ওয়ার্ডস্বার্থ, শেলী এবং ব্রাউনিঙ্—কেশবসুত পাড়ি জমিয়েছিলেন সেই সমুদ্রে।

জীবনী

কেশবসুতের জন্মকাল ও জন্মস্থান নিয়ে মতদ্বৈধ আছে। কবির প্রথম জীবনচরিত লিখেছেন তাঁর ছোট ভাই সীতারাম কেশব দামলে। তাঁর কাছে কেশবসুতের যে জন্মপত্রিকা ছিল তার উপর নির্ভর করে তিনি জন্মকাল লিখেছিলেন ১৪ ফাল্গুন ১৭৮৭ শকাব্দ, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ১৮৬৬ অব্দের ১৫ মার্চ। এই তারিখ নিয়ে অনেকে আপত্তি করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন কোষ্ঠীতেই কিছু ভুল থেকে থাকবে। কেউ কেউ ভারতীয় তিথি গণনা-অনুসারে মলমাস যোগ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ভারতীয় ও ইংরেজি তারিখের মধ্যে মিল নেই। কারও কারও মতে কেশবসুত জন্মেছিলেন ৭ অক্টোবর ১৮৬৬ অব্দে। যে 'কাব্যরত্নাবলী' পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর কবিতা প্রকাশিত হত, তাঁদের ১৯০৫ অব্দের ডিসেম্বর সংখ্যায় কেশবসুতের মৃত্যুর কাল বলতে গিয়ে তাঁরা লিখেছিলেন যে ১৮৬৬ অব্দের মার্চ মাসে তাঁর জন্ম। ১৯০৬ অব্দের 'মনোরঞ্জন' পত্রিকায় কেশবসুতের পরলোকগমন প্রসঙ্গে তাঁরাও এই মার্চ মাসের উল্লেখ করেন। এই সব নানাবিধ প্রমাণ থেকে এইটুকুই নিশ্চিত বলা যায় যে কেশবসুতের জন্ম হয়েছিল ১৮৬৬ অব্দে—যদিচ জন্মতারিখ নিয়ে মতের মিল দেখা যায় না। মার্চ ১৯৬৬ সংখ্যা 'সত্যকথা' পত্রিকায় এই বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে লিখতে গিয়ে শ্রীমতী বিজয়া রাজাধ্যক্ষ ৭ অক্টোবর ১৮৬৬ তারিখটাই কবির জন্মতারিখ বলে চিহ্নিত করেছেন।

তাঁর জন্মস্থান এমন কি মৃত্যুর তারিখ নিয়েও মতভেদ দেখা যায়। যদিচ তাঁর জীবনীকারদের কেউ কেউ মনে করেন যে মহারাষ্ট্রের কোংকণ অঞ্চলে রত্নাগিরির নিকটবর্তী মালগুণ্ড গ্রামে তাঁর জন্ম, কবির নিজের লেখা স্কুল রেকর্ড্-অনুসারে দেখা যায় তিনি জন্মেছিলেন দাপোলী জেলার কলণে নামক গ্রামে। সম্প্রতি মহারাষ্ট্রের রাজ্য-সরকার কবির জন্মস্থানে স্মারক নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য এক সভা ডাকেন। সেই সভাতেও কোন বাড়িতে তিনি যে জন্মেছিলেন—এই প্রশ্ন নিয়ে মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল।

কবির মৃত্যু তারিখ নিয়েও মতভেদ আছে। তিনি যে ৩৯ বছর বয়সে অকালে প্লেগ রোগে কিংবা কলেরায় হুব্‌লি শহরে মারা যান, সে কথা নিশ্চিত। বলা হয় ১৯০৫ অব্দে নভেম্বর মাসের কোনো এক দিন দুপুরবেলা তাঁর প্রাণবিয়োগ হয় এবং তাঁর মৃত্যুর আট দিন পরে ১৯০৫

অব্দের ১০ নভেম্বর তাঁর স্ত্রীও মারা যান। এতৎসত্ত্বেও শ্রী ন. শং. রহাল-কার ও কেশবসুতের জীবনীকার সেই ছোট ভাই কবির মৃত্যুতারিখ ২ নভেম্বর বলে স্থির করেছেন। এই ভাই ছিলেন কবির চেয়ে বারো বছরের ছোট। 'কেশবসুতাঁচ্ কবিতা' নামে কাব্যসংগ্রহের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাস্বরূপ তিনি এই জীবনকথা রচনা করেছিলেন। এটিই কবির প্রথম জীবনচরিত। এই তারিখের ভুল পরে কেশবসুতের জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীপরশরাম চিন্তামণ দামলে উক্ত কাব্যসংগ্রহের চতুর্থ সংস্করণে সংশোধন করে দেন। সুতরাং ১৯০৫ অব্দের ৭ নভেম্বর কেশবসুতের মৃত্যুর তারিখ বলে নিশ্চিত মেনে নেওয়া যায়।

তাঁর রচিত কবিতার দু জায়গায় কবির জন্মস্থানের উল্লেখ দেখা যায়। 'নৈঋত্যেকডীল বারা' (নৈঋতকোণের বাতাস) কবিতায় তিনি মালগুণ্ড গ্রামের সংস্কৃত রূপান্তর দিতে গিয়ে বলেছেন মাল্যকূট। কোনো কোনো সমালোচকের মতে 'এক খেড়ে' (এক গ্রাম) নামক বাল্যস্মৃতিবিজড়িত একটি গ্রামের বর্ণনায় তিনি যা লিখেছেন, তার ফুল ফল, গাছপালা, পশুপাখি এবং 'কত যে তরী জাহাজ ভেসে যায়, সুনীল দরিয়ায়—...' এই সব উল্লেখ থেকে যে জায়গার কথা স্বতঃই মনে পড়ে, সে হল বলণে।

পু. কে. দামলে কবির বংশলতা এইভাবে দিয়েছেন :
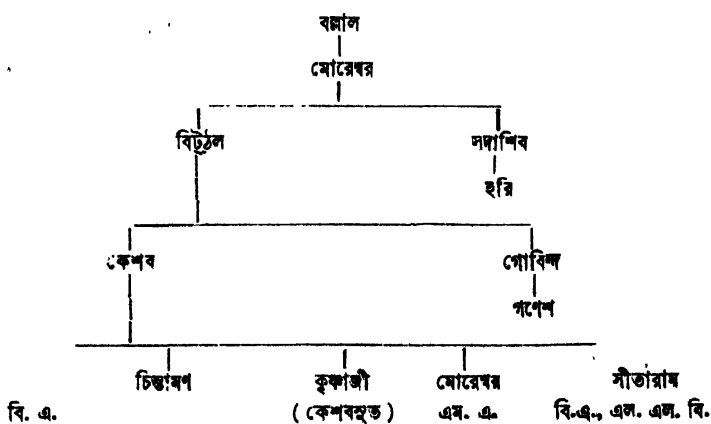
দামলেরা ছিলেন চিৎপাবন কোকণস্থ ব্রাহ্মণ। এঁদের আদিনিবাস ছিল রত্নাগিরির কাছাকাছি কোলং গ্রামে। কেশবসুতের বাবা কেশবসুত বিট্ঠল ওরফে কেসোপন্ত দামলে মারাঠী স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করে, পৈতৃক পেশা চাষবাস ছেড়ে স্কুল মাস্টারের কাজ নেন। তখন তাঁর বয়স ছিল

পনেরো বছর। সরকারী শিক্ষাবিভাগে চাকরি করতে করতে তাঁর মাসিক বেতন তিন টাকা থেকে শুরু করে বাড়তে বাড়তে ত্রিশ টাকা অবধি পৌঁছায়। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় তিনি দশ-এগারো টাকার পেন্সন নিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেন। অতঃপর তিনি বিশ্বনাথ নারায়ণ মণ্ডলীক নামধেয় একজন প্রসিদ্ধ গ্রামনেতা ও দামলে পরিবারের হিতৈষী জমিদারের বলগে' গ্রামে অবস্থিত জমিজমার তদারকি কাজে নিযুক্ত হন। 'সিংহাবলোকন' নামে একটি কবিতায় কেশবসুত এই গ্রামের কথা লিখেছেন। কবিতাটি ওয়র্ডস্বার্থ-এর 'দি প্রিলিউড' কবিতার ঢঙে লেখা। যদিও কেসোপন্তের আয় ছিল সামান্য, তিনি ধারকর্জ না করে এক প্রকার মনের সুখেই সংসারনির্বাহ করতেন। নিয়মনিষ্ঠা, স্পষ্টবাদিতা ও দৃঢ়সংকল্পের জন্য তাঁর বেশ সুনাম ছিল। কেশবসুত কবিতায় তাঁর পিতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে গেছেন। ১৮৯৩ অব্দে কেসোপন্তের মৃত্যু হয়।

কেশবসুতের মা ছিলেন মালদোলীর জমিদার করন্দীকর পরিবারের কন্যা। তিনি ছিলেন তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান। ১৯০২ অব্দে উজ্জয়িনীতে তাঁর মৃত্যু হয়। মায়ের কাছ থেকে কেশবসুত পেয়েছিলেন তাঁর ভাবুক স্বভাব, ভগবদ্‌ভক্তি, চিত্তের প্রসার ও উদার মানবিকতা। মায়ের মৃত্যুর পর কেশবসুত একটি শোকগাথা রচনা করেছিলেন।

কেশবসুত ছিলেন তাঁর মা-বাবার চতুর্থ সন্তান। ওঁরা ছিলেন পাঁচ ভাই ও ছ বোন। বড় ভাই এগারো বছর বয়সে জলে ডুবে মারা যান। মেজো ভাই ছিলেন শ্রীধর। মেধাবী ছাত্র হিসাবে তাঁর খুব নাম ছিল। রত্নাগিরি কেন্দ্র থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য তিনি জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮২ অব্দে এলফিনস্টোন কলেজ থেকে তিনি বি. এ. পাশ করেন ও বড়োদার নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু কাজে যোগ দেবার এক বছর পরেই ১৮৮৩ জানুয়ারিতে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি মারা যান।

শুরুতে কেশবসুতের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি যথোচিত নজর দেওয়া হয় নি। রত্নাগিরি জেলার খণ্ড নামক গ্রামে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তিনি আর তাঁর ছোট ভাই একই সঙ্গে পড়তেন। পরে ইংরেজি শেখার জন্য দুই ভাইকেই বড়োদা পাঠানো হয়। তখনকার কালের প্রথা অনুসারে বাল্য বয়সেই দুই ভায়ের বিয়ে দেওয়া হয়। তখন কেশবসুতের বয়স ১৫ ও তাঁর ছোট ভাইয়ের ১৩। কেশবসুতের স্ত্রী রুক্মিণীবাই ছিলেন চিতলে পরিবারের মেয়ে। বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল আট বছর। রুক্মিণীবাই সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। শোনা যায় তাঁর খুব দয়ামায়া ছিল,

কায়িক পরিশ্রমে তিনি খুব পটু ছিলেন, কিন্তু তিনি সুন্দরী ছিলেন না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ছিলেন লাজুক প্রকৃতির ও অ-সামাজিক। কেশবসুতের তিন মেয়ের নাম ছিল মনোরমা, বৎসলা ও সুমতী। 'ঙ্কাতারী' কবিতায় কেশবসুত তাঁর মেজো মেয়ের কথা লিখে গেছেন। কেশবসুতের শ্বশুর কেশব গঙ্গাধর চিতলে ছিলেন খান্দেশ জেলার চালিশগাঁও গ্রামের একটি মারাঠী স্কুলের হেডমাস্টার।

কেশবসুতের ছেলেবেলা সম্বন্ধে যতটুকু জানা যায় তা থেকে মনে হয় তিনি দুর্বল ছিলেন ও তাঁর স্বভাব ছিল বেশ খিটখিটে। দুর্বল শরীরের জন্য তিনি খুব বেশি দৌড়ঝাঁপ বা পরিশ্রমসাধ্য খেলাধুলা করতে পারতেন না। একা একা দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে বেড়াতেন ও কথা বলতেন খুবই কম। তাঁর মা বলতেন যে ছেলেটা কেমন যেন খেয়ালী মতন। যদিচ তাঁর চেহারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তাঁর বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু কিছু বলেছেন। 'তিনি ছিলেন বেশ ভাবুক ও গম্ভীর প্রকৃতির' (কিরাত)। 'সচরাচর মুখ নিচু করে কথা বলতেন, কিন্তু চোখ তুলে চাইলে মনে হত তাঁর দৃষ্টি অন্তর্ভেদী' (বিনায়ক করন্দীকর)। 'তিনি মাথায় ছিলেন পাঁচ ফুটের সামান্য বেশি' (গদ্রে)। তাঁর গায়ের রঙ ছিল গৌর, মুখের ডোল ছিল গোল, কপাল সারাক্ষণ কুঁচকে থাকত। একবার তাঁর বিষণ্ণ মুখ দেখে একজন মাস্টারমশায় কবিকে তিরস্কার করেছিলেন। কেশবসুত তাঁর 'দুর্মুখলেলা' কবিতায় লিখেছেন :

কুরূপ কবি বিধির বরে
করবে নূতন রচনা,
পড়বে দেখো জগত জনে
হরষ ভরে কত না।
এমুখ থেকেই ঝরবে জেনো
অমৃতেরি নির্ঝরণ,
পান করে সে মধুর সুধা
তৃপ্ত হবে বিশ্বজন।
কুরূপ দেখে বিরূপ তুমি,
দেখবে তোমার বংশধর
কবির কেমন আনন ছিল
কইবে নাকো অতঃপর।

(১৮৮৬)

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো—নিজের ফোটো তোলায় কবির অসাধারণ বিরাগ ছিল। যদিচ তাঁর ভাইদের ফোটো পাওয়া যায়, তাঁর জীবিত-কালে কেশবসুতের ফোটো নেওয়াও হয়নি, ছবি আঁকাও হয়নি। উজ্জয়িনীতে তাঁর দাদা দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে একবার দামলে পরিবারের সকলে একত্রিত হয়েছিলেন। প্রস্তাব হয় সমস্ত পরি-বারের একটি ফোটো তোলা হোক—কেশবসুত সে প্রস্তাবে রাজি হন নি।

বাল্যকালে তাঁর শিক্ষা নানাভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। তাঁর একটি কবিতায় দেখা যায় তখনকার দিনে মাস্টারমশায়রা ছেলেদের বেদম প্রহার করতেন ও নানারকম সাজা দিতেন। এতে তিনি গভীর আঘাত পেয়ে-ছিলেন এবং তাঁর মন থেকে এই দাগটুকু কখনো মুছে যায় নি।

১৮৮২ অব্দে কেশবসুত বড়োদায় তাঁর দাদা শ্রীধর কেশবের কাছে যান। তিনি তখন বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে বি. এ. পাশ করে সংস্কৃত ও গণিতের অধ্যাপকরূপে সেখানে কাজ করছেন। দুঃখের বিষয় দাদার ওখানে কেশবসুত আট মাসের বেশি থাকতে পারেন নি। মাত্র তেইশ বছর বয়সে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে শ্রীধর অকালে প্রাণত্যাগ করেন—বি. এ. পাশ করার ঠিক এক বছর বাদে। সমস্ত দামলে পরিবার এই শোকের আঘাতে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। পড়াশুনো চালিয়ে যাবার জন্য কেশবসুতকে তখন চলে যেতে হয় তাঁর মামা রামচন্দ্র গণেশ করন্দীকরের আশ্রয়ে। ইনি ওয়ার্ধায় ওকালতি করতেন। তখনকার দিনে ওয়ার্ধায় ইংরেজি শেখার সুব্যবস্থা ছিল না। এইজন্য 'কৃষ্ণাজী' ও তাঁর ছোট ভাই মোরোপন্তকে নাগপুরে পাঠানো হয়। কিন্তু নাগপুরে ছেলেদের শিক্ষার ব্যয় চালাবার মতো অবস্থা কেশবসুতের বাবার ছিল না, তাছাড়া নাগপুরের প্রচণ্ড গরম কেশবসুতের দুর্বল স্বাস্থ্যের পক্ষে অসহ্য মনে হয়েছিল। নাগপুরে তিনি যে সাত মাসকাল ছিলেন, সে সময় প্রসিদ্ধ মারাঠী কবি রেভারেণ্ড নারায়ণ বামন টিলক এবং অধ্যাপক পটবর্ধনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। শেষোক্তের উপরে তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটি কবিতাও লিখেছিলেন।

রেভারেণ্ড নারায়ণ বামন টিলকের সংস্পর্শে এসে কেশবসুত কবিতা রচনায় প্রেরণা লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে টিলক লিখেছেন : "কেশবসুতের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ ছিল। তাঁর কবি-প্রতিভার বিকাশ আমি সূচনা থেকে অনুধাবন করেছিলাম। ১৮৮৩ অব্দে আমরা নাগপুরে দু-তিন মাসের জন্য বেশ কাছাকাছি আসতে পেরেছিলাম। পরে তাঁর সঙ্গে ১৮৮৮-৮৯ অব্দে পুণায়, এবং ১৮৯৫-৯৬ অব্দে বোম্বাই শহরে আবার

দেখা-সাক্ষাৎ হয়।" পুণায় যখন দেখা হয় তখন কেশবসুত নিউ ইংলিশ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছেন। বোম্বাইয়ে দেখা হবার সময় কেশবসুত খ্রীষ্টীয় মাসিক 'জ্ঞানোদয়' পত্রিকার কার্যালয়ে নিযুক্ত ছিলেন। টিলক পূর্ব থেকেই 'জ্ঞানোদয়' পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৮৯৫ অব্দের ১০ ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টান হন। টিলক ও 'জ্ঞানোদয়' পত্রিকার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক থাকার দরুন কেশবসুতের আত্মীয়বর্গের আশংকা হয়েছিল তিনিও না খ্রীষ্টান হয়ে যান। কেশবসুত বাইবেল পড়তে খুব ভালোবাসতেন। একবার তিনি তাঁর ছোট ভাই সীতারামকে বলেও ছিলেন যে তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করায় ইচ্ছুক (দ্রঃ বি. স. করন্দীকর, 'রত্নাকর', ফেব্রুয়ারি—১৯২৬)। টিলকের সঙ্গে বন্ধুতা থাকা সত্ত্বেও তাঁদের দুজনের কবিতার মধ্যে পার্থক্য ছিল বিস্তর। কেশবসুতের কবিতায় ওজস্বিতা ও প্রতিভার একটা অপ্রত্যাশিত চমক ছিল। টিলকের কাব্য ছিল শান্ত ভাবের, উদ্দীপনার ওঠাপড়া তাঁর মধ্যে তেমন ছিল না। টিলক কেশবসুতের এমনই গুণ-গ্রাহী ছিলেন যে তাঁর জীবিতকালেই তিনি কেশবসুতের উপর একটি কবিতা রচনা করেন। কবির মৃত্যুর পর তিনি দুটি শোকের কবিতা লিখেছিলেন, একটি জানুয়ারি ১৯০৬ সংখ্যা 'কাব্যরত্নাবলী' ও অন্যটি ফেব্রুয়ারি ১৯০৬ সংখ্যা 'মনোরঞ্জন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নাগপুরে তিনি যে অল্পকালের জন্য ছিলেন, সে সময় কেশবসুতের সঙ্গে সমাজ সংস্কারক বাসুদেব বলবন্ত পটবর্ধনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। ১৮৮৮ অব্দে পটবর্ধনের প্রশস্তিতে তিনি একটি দীর্ঘ কবিতা লেখেন। অনুমান হয় কাব্যের আদর্শ বিষয়ে পটবর্ধনের মতবাদ কবির উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকবে। এঁরা দুজনেই ছিলেন প্রগতিবাদী, দুজনেই নির্জনতা ভালোবাসতেন ও লোকজনের ভিড় পছন্দ করতেন না। পরে পটবর্ধন ডেকান এডুকেশন সোসাইটির আজীবন সদস্যশ্রেণীভুক্ত হন এবং আগরকরের পরে 'সুধাকর' অর্থাৎ 'সংস্কারক' পত্রিকার সম্পাদক হন। পট-বর্ধনের উপর কেশবসুত যে-কবিতা লিখেছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন :

আত্মার আলো হয়ে জ্বলে আকাশে
সে আলো স্বচ্ছ
কবির মুগ্ধ চোখে।
জমাট দুখের অন্তর হেরে কবি
অনড় অটল
প্রস্তর দেখে লোকে।

কোনো কোনো সমালোচক এই কয় ছত্রে এমার্স'ন-এর প্রভাব দেখতে পান। আসলে এমার্স'ন প্রভাবিত হয়েছিলেন বেদান্তের দ্বারা। কেশবসুত নিজের অজ্ঞাতে অপ্রত্যক্ষভাবে এখানে সর্বভূতাত্মার উল্লেখ করেছেন।

১৮৮৩ অব্দে কেশবসুত নাগপুর ছেড়ে, কোংকণস্থ নিজ গ্রাম খেড়-এ ফিরে যান এবং সেখানে এক বছর বসবাস করেন। অতঃপর উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পুণায় যান। নিউ ইংলিশ স্কুলের কাগজপত্রে দেখা যায় ১৮৮৪ অব্দের ১১ জুন কেশবসুত এই স্কুলে ভর্তি হন। তিনি ১৮৮৯ অব্দ অবধি পুণায় বসবাস করেন, এবং চব্বিশ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পাশ করেন। এরকম পরিণত বয়সে তাঁর ম্যাট্রিক পাশ করার অন্যতম কারণ—তিনি দু-দুই বার ইংরেজিতে যথেষ্ট নম্বর না পাওয়ার দরুন, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। ফেল হবার আর একটি কারণ এই যে তিনি খুব ধীরে ধীরে লিখতেন। একবার তো কাব্যচর্চায় এমন মশগুল হয়েছিলেন যে যথাসময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পর্যন্ত যেতে পারেন নি।

নিউ ইংলিশ স্কুলে থাকা-কালে তাঁর সঙ্গে হরিনারায়ণ আপটের সঙ্গে পরিচয় হয়। ইনি মরাঠী ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসকার। ইনিই কেশব-সুতের মৃত্যুর পর তাঁর লেখা একমাত্র কবিতাসংগ্রহের সম্পাদনা ও প্রকাশনার ভার নেন। আপটে কেবল যে কেশবসুতের সহপাঠী ছিলেন এমন নয়—তিনি কবির অন্তরঙ্গ বন্ধুও ছিলেন। পুণাতে থাকতেই গোবিন্দ বাসুদেব কানিকটকরের সঙ্গে কেশবসুতের সাক্ষাৎ হয়। কানিটকর ছিলেন একাধারে কবি ও অনুবাদক। ইংরেজি সাহিত্যে এ'র গভীর অনুরাগ ছিল এবং স্ত্রী-শিক্ষার ইনি একজন বড় সমর্থক ছিলেন। কানিটকরের পত্নীও একজন বিদুষী মহিলা ছিলেন। জাস্টিস মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে কানিটকরের আখ্যানমূলক দীর্ঘ কবিতার প্রশংসা করে গেছেন। ওয়াল্টার স্কটের অনুসরণে ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে কানিটকর কয়েকটি কবিতা রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'আকবর' ও 'কৃষ্ণকুমারী'। কানিটকর মিসেস হাইমেন্স, এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ্ ও তরু দত্তের কবিতার ভক্ত ছিলেন। টমাস মুর, টমাস হুড, বাইরণ, বার্ণ্স, কীটস প্রভৃতি কবির কবিতা তিনি মারাঠীতে অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনূদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জন স্টুয়ার্ট মিল-এর 'সাবজেকশন অব উইমেন' অর্থাৎ নারীর দাসত্ব। কানিটকর দম্পতি, আপটে ও কেশবসুত নিয়মিত লেখা পাঠাতেন 'মনোরঞ্জন আনি নিবন্ধচন্দ্রিকা' নামক মাসিকপত্রে। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯০ অব্দ পর্যন্ত এই পত্রিকায় কেশবসুতের তেরোটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে নিয়মিত ইংরেজি কাব্যপাঠের দ্বারা কেশবসুতের কবিপ্রতিভা বিকশিত হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বলেন ইংরেজি কাব্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সীমিত ছিল পলগ্রেভ্-এর 'গোল্ডেন ট্রেজারী' ও ম্যাকে-এর 'এ থাওজেন্ড এন্ড ওয়ান জেমস অব ইংলিশ পোয়েট্রি' দ্বারা। কিন্তু তিনি যে আরও অনেক কিছু পড়েছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বহু চিঠিতে এমার্সন-এর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দেখে। তিনি যে তরু দত্তের 'এ শীফ গ্লিনড্ ইন ফ্রেঞ্চ ফিল্ডস্' পড়েছিলেন, তারও প্রমাণ দেখা যায়। তিনি ড্রামন্ড, গ্যেটে, পো, লংফেলো এবং সেক্সপীয়র-এর কিছু কিছু সনেট অনুবাদ করেছিলেন। ইংরেজিতে কবিতা রচনাতেও তিনি হাত লাগিয়ে ছিলেন। অধ্যাপক মং. বি. রাজাধ্যক্ষ তাঁর 'পাঁচ মারাঠী কবি' গ্রন্থে লিখেছেন যে কেশবসুত সংস্কৃত কাব্যও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক সে কথা মেনে নেন নি কারণ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় কেশবসুত সংস্কৃতে ভালো নম্বর পান নি বলে দেখা যায়।

যদিচ নিউ ইংলিশ স্কুলে আগরকর ও লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো প্রখ্যাত অধ্যাপকেরা ছিলেন, দেখা যায় তাঁরা যেসব বিষয় পড়াতেন তাতে কেশবসুতের তেমন রুচি বা আগ্রহ ছিল না। বরঞ্চ তাঁর উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন সমাজসংস্কারক আগরকর। কেশবসুত ক্লাসে বসে কাগজের উপর হিজিবিজি কাটতেন, লোকমান্য প্রভৃতি অধ্যাপকদের ব্যঙ্গচিত্র আঁকতেন। কিন্তু সমসাময়িক কালের নামজাদা বাগ্মীদের প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পুণার আকাশে তখন আসন্ন ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ১৮৮০ অব্দ থেকে চিপলুণকর তাঁর 'নিবন্ধমালা' পত্রিকায় বলতে লেগেছেন যে ইংরেজি শিক্ষা হল 'বাঘের দুধ' খাওয়ার নামান্তর। তিলক 'কেশরী' পত্রিকার স্তম্ভে তখন সিংহনাদ করছেন। আগরকর তাঁর 'সুধাকর' পত্রিকায় সমাজসংস্কারের নতুন যুগকে আবাহন করছেন। কির্লোস্কর ও ভাবে-এর হাতে মরাঠী রঙ্গমঞ্চ তখন নূতনভাবে নির্মিত হচ্ছে। হরিনারায়ণ আপটে মারাঠী কথাসাহিত্যকে নূতন রূপ দান করেছেন। কিন্তু কেশবসুত মানুষটা ছিলেন লাজুক প্রকৃতির। রাষ্ট্রিক বা সামাজিক আন্দোলনের রথ যে-সব পথ প্রকম্পিত করে চলে, সেই সব পথে তাঁর আনাগোনা ছিল না বললেই চলে। কাব্যরচনার অভ্যস্ত পথে চলতে গিয়ে তিনি হয়তো শেলীর মতো ভেবেছিলেন :

নব জীবনের আবাহন উৎসবে
ছড়াব দুহাতে মরণের ঝরাপাতা···
(ওড্ টু দি ওয়েস্ট উইন্ড)

এখানে কবির উপর তাঁর দুই ভাইয়ের অপ্রত্যক্ষ প্রভাব বিষয়ে দুচার কথা বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর ছোট ভাই মোরো কেশব দামলে (১৮৬৮-১৯১৩) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন ও ইতিহাসে বি. এ. পাশ করেন। উজ্জয়িনীর মাধব কলেজে ১৮৯৪ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত তিনি দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯০৮ অব্দে উজ্জয়িনীর কলেজ বন্ধ হয়ে যাবার পর তিনি নাগপুর সিটি স্কুলে শিক্ষকরূপে যোগ দেন। ১৯১৩ অব্দে পুণায় এক শোচনীয় রেল দুর্ঘটনার ফলে অকালে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯১১ অব্দে এঁর রচিত মারাঠী ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠাব্যাপী এই গ্রন্থ হল বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লেখা প্রথম মারাঠী ভাষার ব্যাকরণ। অবশ্য পরবর্তীকালে বৈ. কা. রাজবাড়ে প্রমুখ সংস্কৃত পণ্ডিতেরা এই ব্যাকরণের প্রামাণিকতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বার্ক্-এর বক্তৃতাবলী অনুবাদ করেছিলেন ও সর্বপ্রথম মারাঠী ভাষায় লজিক অথবা তর্কশাস্ত্রের উপর পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। অপর যে ভাই, তাঁর নাম ছিল সীতারাম কেশব দামলে (১৮৭৮-১৯২৭)। তিনি ছিলেন সাংবাদিক, ঔপন্যাসিক ও দেশভক্ত। 'জ্ঞানপ্রকাশ' ও 'রাষ্ট্রমত' এই দুই কাগজের সম্পাদকীয় বিভাগে তিনি কাজ করতেন। মুলশী সত্যাগ্রহে যোগ দেবার জন্য দু-বছরের মেয়াদে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। দামলে পরিবারের সকলেই প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু বেশির ভাগই ছিলেন অল্পায়ু। কেশবসুতের কবিতায় একটি যে বিয়োগান্ত বেদনার সুর প্রচ্ছন্ন রয়েছে, তার হয়তো অন্যতম কারণটাই এই।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর দারিদ্র্যহেতু কেশবসুত উচ্চশিক্ষার জন্য অগ্রসর হতে পারেন নি। ১৮৯০ অব্দে তিনি চাকরীর খোঁজে বোম্বাই যান। ডিগ্রী না থাকার দরুন তাঁর মনোমত চাকরী পেতে বেগ পেতে হয়েছিল। উপরন্তু তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল অতি তীক্ষ্ন, ফলে বি. না. মণ্ডলিক-এর মতো যে-সব পারিবারিক বন্ধু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকে তিনি কোনো সহায়তা নিতে চান নি। প্রথমে তিনি একটি মিশন স্কুলে মাস্টারীপদে যোগ দেন, পরে আমেরিকান মিশনারীদের পরিচালিত 'জ্ঞানোদয়' নামে খ্রীষ্টধর্মীয় পত্রিকার অফিসে কাজ নেন। তারও কিছু কাল পরে তিনি দাদর অঞ্চলে দাদর ইংলিশ স্কুলের মাস্টার হন। মাসে বিশ-পঁচিশ টাকার বেশি বেতন তিনি কখনোই পাননি। ফলে সংসার খরচ নির্বাহের জন্য তাঁকে গৃহশিক্ষকতা করতে হত। আবার যখন বেকার হয়ে পড়তেন তখন নিতান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দেশের গ্রামে তাঁকে ফিরে যেতে হত। ছেলে এরকম অনিশ্চিত ওঠা-পড়ার মধ্যে দিয়ে কায়ক্লেশে

জীবিকা অর্জন করবে, স্রোতের শেওলার মতো কেবল ভেসে বেড়াবে, কোথাও খ্নটি গাড়তে পারবে না—এরকম অবস্থা কেশবস্নতের বাবার কাছে অসহ্য মনে হয়েছিল। তিনি চেয়েছিলেন ছেলে যেন কোনো একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠা পায়, নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ১৮৯৩ অব্দে কেশবস্নত স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বোম্বাই চলে যান। 'সিংহাবলোকন' প্রভৃতি কবিতায় যে স্মৃতিচিত্র পাওয়া যায় তা থেকে এ-সব পারিবারিক বাদবিসম্বাদের কিছ্ন কিছ্ন আন্দাজ পাওয়া যায়। কেশবস্নত ১৮৯১ অব্দে কল্যাণ অঞ্চলের এক ইংরেজি স্কুলে মাস্টারী পদে যোগ দেন। মাস্টারী করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি মিলিটারি কমিসেরিয়েট বিভাগে কেরাণীর কাজ করতে থাকেন। টেলিগ্রাফে খবর পাঠাবার সিগন্যালিং-কাজও শিখতে থাকেন। ইচ্ছার বির্নদ্ধে তাঁকে করাচীতে বদলি করা হয় বলে তিনি কমিসেরিয়েট-এর কাজ ছেড়ে দেন। ১৮৯৩ অব্দে ছয় মাসের জন্য তিনি সামন্তবাড়ি অঞ্চলে শিক্ষকতা করেন।

কেশবস্নত যখন মাস্টারী কাজ নিয়ে বোম্বাইয়ের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে থাকবেন বলে স্থির করেছেন সেই সময় তাঁর সঙ্গে তিনজন তর্নণ সাহিত্যিক ও সম্পাদকের পরিচয় হয়। এ'রা ছিলেন কাশিনাথ রঘ্ননাথ মিত্র, জনার্দন ধোঁড়ো ভাঙ্গলে আর গোবিন্দ বালকৃষ্ণ কালেলকর। এই সময় কেশবস্নত 'বিদ্যার্থী মিত্র' ও 'মাসিক মনোরঞ্জন' (স্থাপিত ১৮৯৫)—এই দ্নই পত্রিকায় বেশ কিছ্ন কবিতা প্রকাশ করেন। মিত্র ও ভাঙ্গলে উভয়েরই বাংলা ও গ্নজরাটী ভাষায় বেশ দখল ছিল। ভাঙ্গলে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও একটি গ্নজরাটী উপন্যাস মারাঠী ভাষায় অন্নবাদ করেন। ১৮৯৪ অব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'আনন্দমঠ' 'আনন্দ আশ্রম' নামে ভাষান্তরিত হয়। সেকালের প্রসিদ্ধ জাতীয় সংগীত 'বন্দেমাতরম্' এই অন্নবাদে অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেশবস্নত তাঁর 'কবিতেচে প্রয়োজন' (মে, ১৮৯৯) কবিতায় জন্মভূমির উল্লেখ করতে গিয়ে 'বন্দেমাতরম্' গানের 'স্নজলা' 'স্নফলা' বিশেষণ প্রয়োগ করেন। বোম্বাইয়ে থাকাকালীন কেশবস্নত আরও যে-সব কবির সংস্পর্শে আসেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'মাধবান্নজ' (ডাঃ কাশীনাথ হরি মোডক, ১৮৭২—১৯১৬), 'কিরাত' এবং গজানন ভাস্কর বৈদ্য (যিনি পরে 'হিন্দ্ন মিশনারী' নামে বিখ্যাত হন)। বৈদ্য-এর ভাই স্মৃতি থেকে কেশবস্নতের একটি রেখাচিত্র এ'কেছিলেন। কেশবস্নত প্রর্থনাসমাজ (মহারাষ্ট্রে বাংলা দেশের ব্রাহ্মসমাজের অন্নর্নপ প্রতিষ্ঠান), আর্যসমাজ ও খ্নষ্টীয় মিশনারী সোসাইটি প্রভৃতির আয়োজিত বক্তৃতায় উপস্থিত থাকতে ভালবাসতেন। ১৮৯৬ অব্দে বোম্বাইয়ে যখন দ্নরন্ত

মহামারী প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, সে সময় কেশবসুত শহর ছেড়ে খানদেশ-এর অন্তর্গত ভড়গাঁও নামক গ্রামে আশ্রয় নেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যে তাঁর স্ত্রীপুত্র পরিবারাদি চালিসগাঁওয়ে তাঁর শ্বশুরের আশ্রয়ে নিরাপদে থাকেন। শ্বশুর চালিসগাঁও-এর স্কুলে হেডমাস্টারী করতেন। শ্বশুরের পরামর্শক্রমে তিনি ভড়গাঁও এংলো ভার্ণাকুলার স্কুলে মাস্টারী পদের জন্য দরখাস্ত করেন এবং মাসিক ১৫৲ টাকা বেতনে বহাল হন।

১৮৯৭ থেকে ১৯০৪ অব্দের মার্চ পর্যন্ত কেশবসুত খানদেশ-এ বসবাস করেন। গোড়ায় তিনি শিক্ষকতা করতেন ভড়গাঁও-এর মুানিসি-প্যাল স্কুলে। কিন্তু সেখানে বেতন কম ও পেন্সন-এর সুবিধা ছিল না বলে, ১৮৯৮ অব্দে তিনি সরকারী এস. টি. সি. পরীক্ষায় বসেন ও পাশও করেন। ১৯০১ অব্দে তিনি খানদেশ-এর ফৈজপুর হাইস্কুলে ইংরেজির মাস্টাররূপে যোগদান করেন। দুর্ভাগ্যের কথা বলতে হবে, পরের বছরেই ফৈজপুরে প্লেগের ধ্বংসলীলা শুরু হয় এবং আশংকা হয় যে হাইস্কুল হয়তো বা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। উপরন্তু, কবি কারও পরোয়া করতেন না ও নিজের মতামত খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করতেন বলে, স্কুলের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর ঠিক বনিবনাও হচ্ছিল না। তিনি বদলির জন্য দরখাস্ত দিলেন, দরখাস্ত মঞ্জুরও হয়ে গেল। ১৯০৪ অব্দের এপ্রিল মাস থেকে কেশবসুত ধারবাড় হাইস্কুলের মারাঠী শিক্ষকরূপে যোগ দেন।

খানদেশ-এ থাকতে 'কাব্যরত্নাবলী' বলে কেবল কবিতার এক মাসিক-পত্রের সম্পাদকমশায়ের সঙ্গে কেশবসুতের পরিচয় হয়। এ'র নাম ছিল নারায়ণ নরসিংহ ফড়নীস। ইনি কবিতার একজন খাঁটি সমঝদার ছিলেন। কেশবসুতের বিষয়ে লিখেছেন : "যে-পাঁচজন কবি মারাঠী কাব্য-সাহিত্যের রত্নস্বরূপ ছিলেন, কেশবসুত ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁদের নিয়ে 'কাব্যরত্নাবলী' পত্রিকার বিশেষ গর্ব ছিল। তাঁর শেষ কবিতা যা আমরা প্রকাশ করি তার নাম ছিল 'হরপাল শ্রেয়' (হারানো আদর্শ)। কবি হিসাবে তিনি স্বাধীনচেতা ছিলেন। তাঁর কবিতার মহিমা ও তাঁর চিন্তাধারার ব্যাপ্তি যেমন আনন্দের তেমনি বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তিনি ব্যবহারিক জীবনে অনভ্যস্ত ছিলেন বলে কখনো কখনো তাঁকে অব্যবস্থচিত্ত বলে মনে হত। আমাদের সঙ্গে বার দু-তিন তাঁর চাক্ষুষ সাক্ষাত হয়েছিল। কিন্তু আলাপ-আলোচনায় তাঁর গভীর সংকোচ ছিল বলে খুব বেশি কথাবার্তা হতে পারেনি।" (১৯০৫ অব্দের 'কাব্যরত্নাবলী'র সর্বশেষ সংখ্যা)।

খানদেশ-এ থাকতে আর যে-সব ব্যক্তির সঙ্গে কেশবসুতের সান্নিধ্য ঘটে-

ছিল তাদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত স্বদেশী কবি 'বিনায়ক' (বিনায়ক জনার্দন করন্দীকর ১৮৭২-১৯০১)। ১৮৯১-৯২ অব্দে বোম্বাই শহরে দুজনের সাক্ষাৎ হয়। কেশবসুত তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'মহারাষ্ট্রের বায়রণ'। দুজনের মধ্যে অনেক মিল ছিল—দুজনেই ছিলেন সামাজিক অন্যায় ও রাজনৈতিক দাসত্বের ঘোরতর বিরোধী। কেশবসুতের এই শেষ জীবন অপেক্ষাকৃত আরামে কাটে। এই সময়ে তিনি তাঁর ঈপ্সিত প্রকৃতি-পরিবেশ যেমন পেয়েছিলেন, তেমনি পেয়েছিলেন পঠনযোগ্য প্রচুর পুস্তক। এই সময়ে কাব্যের প্রকৃতি নিয়ে তিনি গভীর বিচারে মগ্ন হন, ও নানারকম তাত্ত্বিক প্রসঙ্গে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে ইংরেজিতে চিঠিপত্র লিখেছেন বলে দেখা যায়। এই সময়ে তাঁর কবিতায় এক অলৌকিক অতীন্দ্রিয় জগতের ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায়।

এপ্রিল ১৯০৪ থেকে দেড় বছরকাল কেশবসুত ধারবাড়ে ছিলেন। এখানে থাকতে জীবনের অসারতা, ও জীবনের অনিবার্য পরিণাম বিষয়ে তিনি নিশ্চয় গভীরভাবে চিন্তা করে থাকবেন। হয়তো তাঁর অকাল বিয়োগের সম্ভাবনাও তিনি অস্পষ্টভাবে অনুমান করে থাকবেন। ১৯০৫ অব্দের ২৫ মে তারিখে চিপলুণে থাকতে তিনি তাঁর যে শেষ কবিতা লেখেন, সে বিষয়ে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন : "'মনোরঞ্জনে' আমার রচনা পড়ে বুঝতে পারবেন সম্প্রতি আমার মনের অবস্থাটা কি রকম। হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু হায়. এই ভগ্নহৃদয়ের প্রতিষেধক কোথায় মিলবে!"

সত্যি, উপায় কিছু ছিল না। ওই বছরে অক্টোবরের শেষে তিনি হুবলিতে যান তাঁর দূর সম্পর্কিত কাকা হরিসদাশিব দামলেকে দেখতে। এই কাকা ছিলেন অসুস্থ ও শয্যাগত। কেশবসুতের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কন্যারাও গিয়েছিলেন। কথা ছিল, চার-পাঁচ দিন হুবলীতে থেকে তিনি ধারবাড় ফিরে যাবেন। কিন্তু ৭ নভেম্বরে তিনি প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়ে দেহত্যাগ করেন। আট দিন পরে তাঁর স্ত্রীও একই মহামারীতে পতির অনুগামিনী হন। অসুস্থ কাকাকেই তাঁদের অন্ত্যেষ্টি সংকার করতে হয়। তাঁদের তিনটি মেয়েকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় কোংকণে। সেখানে অল্প দিনের মধ্যে একটি মারা যায়। অপর দুটির বিবাহ হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

উনচাল্লিশ বছরের একটি হ্রস্ব জীবনের এইভাবে করুণ পরিসমাপ্তি ঘটল। এই অনতিদীর্ঘ জীবনের বিষয়ে কবি আপন কথাতেই বিশদভাবে বলে গেছেন। কবি সম্মেলনের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি একটি ব্যক্তি-

গত পত্রে তাঁর এক বন্ধুকে লিখেছিলেন : "প্রতি বছর কবিদের সম্মেলন বিষয়ে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন? সংসারী লোক বিষয়কর্মের ব্যাপারে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হন। কবিরা তো স্বপ্নবিলাসী লোক। তাঁরা একান্তে থাকবেন, নৈঃশব্দের বাণী শুনবেন কান পেতে। যদি সরস্বতী প্রসন্ন হন, তাহলে সেই বাণী তাঁরা নিজেদের অপরিণত ভাষায় ব্যক্ত করার চেষ্টা করতে পারেন। কদাচিৎ হয়তো দুচার জন সমানধর্মা একত্র হতে পারেন···কিন্তু তার চেয়ে অধিক সংখ্যক লোক যদি ভিড় করে আসে তাহলে তো সমস্ত মজাই মাটি।"

আর একটি চিঠিতে সমসাময়িক মারাঠী কবিতার বিষয়ে অন্য এক বন্ধুকে লিখেছিলেন : "তাঁকে দয়া করে বলবেন তিনি যেন একটি দীর্ঘ কবিতা রচনায় হাত দেন। ছোট ছোট কবিতা লিখে সময় নষ্ট করে কি লাভ! গত একশো বছরের মধ্যে মারাঠীতে একজনও উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ কবিতা রচনা করে যেতে পারেন নি। তাঁর মতো প্রতিভাশালী ব্যক্তির উচিত মারাঠী সাহিত্যের এই কলঙ্ক মোচন করা। দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে আমি নিজে তো বামন। কোনো দিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াব তার কোনো সম্ভাবনাও দেখছি না। নিজের সম্বন্ধে আমি তাই একটা গ্লানি অনুভব করি। আমার মতো যাদের 'ছোট' নজর, তাদের সম্বন্ধে তাই আমার মায়া হয়।"

উপরের উদ্ধৃতি দুটি কেশবসুতের মূল ইংরেজি চিঠি থেকে অনুবাদ।

কেশবসুতের প্রকৃতি-প্রেম

সেনেকা বলেছেন শিল্পকলা মাত্রই প্রকৃতির অনুকরণ। তাঁর কথার প্রতিবাদ করে অস্কার ওয়াইলড বলেছিলেন প্রকৃতিই শিল্পকলার অনুকরণ করে। এই দুই পরস্পরবিরোধী মতের যে-কোনো একটিকে স্বীকার না করেও, কেশবসুতের প্রকৃতি-প্রেম বিষয়ে আমরা দুচার কথা বলতে পারি। কেশবসুতের কবিতায় লক্ষণীয়, প্রকৃতির প্রতি বিষাদগ্রস্ত কবিমনের একটি আসক্তি। প্রকৃতির কোলে তাঁর মনের সমস্ত পিপাসা, তাঁর নিভৃত ভাবনার সমস্ত বেদনা বিসর্জন দিয়ে, তিনি যেন তার কাছে শান্তির একটা আশ্রয় সন্ধান করেছেন। বি. স. খাণ্ডেকর কেশবসুতের লেখা 'একটি গ্রাম' এবং 'নৈঋতের বাতাস' কবিতা প্রসঙ্গে বলেছেন এ-দুটি কবিতায় কোংকণ প্রদেশের পল্লীপ্রকৃতির বুকে ফিরে যাবার জন্য কবিহৃদয়ের একটা গভীর আকুতি দেখা যায়। 'একটি গ্রাম' কবিতায় কেশবসুত লিখেছেন :

নাইবা রইল দেবালয় সেথা অতি উন্নত শির
পর্বত সেথা মহাকাশে মাথা তোলে।
নিত্য মন্ত্র উদ্‌গীত সেথা চঞ্চল নদী নীর
সংগত করে পাহাড়ি হাওয়ার বোলে।

কেবলমাত্র দুটি কবিতায় কেশবসুত প্রকৃতির বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হল 'বর্ষার প্রতি', অন্যটি 'দীপাবলী'। এই শেষোক্তটির প্রথমার্ধ হল ঋতুর বর্ণনা। 'বর্ষার প্রতি' অর্থাৎ 'পর্জন্যাপ্রত' কবিতাটি মাত্র বিশ পঙ্‌ক্তিতে সীমাবদ্ধ। কিন্তু পড়তে গেলে কালিদাসের ঋতু-সংহারের কথা মনে করিয়ে দেয়। নিছক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বর্ণনা দিয়ে কবিতার সূচনা :

নিদাঘদগ্ধ ধরণী কৃষ্ণবর্ণ,
ধেনুদল বৃথা খোঁজে তৃণ আর পর্ণ।
হলকা হাওয়ায় ধুলো ঢোকে চোখে
মুখে ফেনা জমে তৃষ্ণায় ধোঁকে।
খোঁজে কোথা আছে ছায়াতরুতল
পাবে কি না পাবে পিপাসার জল।
ক্লান্ত পথিক গরমে হাঁপায়
গবাদির মতো হেথা ওথা ধায়।

এতো কি দেখেও হবেনা করুণ,
অনুনয় করি, হে দেব বরুণ,
রাবণের পুরী ছেড়ে এসো ত্বরা
নিবারণ করো এদেশের খরা।
তোমারে বরিতে মণ্ডূক সব
বাপীতলে তোলে কত কলরব।
গলাফাটা গানে রজনী অধীর
তবু তুমি রবে অমনি বধির?

'দীপাবলী' শীর্ষক কবিতায় শরৎসুন্দরীর যে বর্ণনা আছে তার মধ্যেও প্রাচীন সংস্কৃত কবিতার স্পর্শ পাওয়া যায়। কেশবসুতের বর্ণনায় এই ঋতু যেন সকালবেলায় রাখাল বালক, দুপুরে তর্পণরত তপস্বী এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে আসা ক্লান্ত কৃষক। তিনি কোনো কোনো কবিতায় ফুল কিম্বা প্রজাপতির কথাও লিখেছেন। কিন্তু তাদের বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্যের কথা ততটা বলেন নি যতটুকু বলেছেন মানবিক দুরবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের প্রতীকী তাৎপর্যের কথা। এসব ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে তিনি ব্যবহার করেছেন তাঁর দার্শনিক মনন চিন্তনের উপাদানরূপে।

অনুমান হয়, কেশবসুত এমার্সন-এর 'প্রকৃতি' নামধেয় প্রবন্ধটি পড়ে থাকবেন। এই প্রবন্ধে এমার্সন আরণ্যক ঋষিদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলেছেন: "প্রকৃতি যেখানে প্রাকৃত, সেখানে সে বন। সেখানে সে চির-তরুণ, আপন মহিমায় মহীয়ান। সেখানে সে সৃষ্টিশীল বলে দৈবশক্তি-সম্পন্ন। যা দিব্য, যা মঙ্গল তা অমর, তার ক্ষয় নেই, শেষ নেই। সে নিজেকে ক্রমাগত বহুতর করতে থাকে, প্রকৃতির সৌন্দর্য-গুণ এমন, যে মনের মধ্যে প্রবেশ করে তা নব নব রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে—কেবল ধ্যানের মধ্যে নয়, পরন্তু নূতন সৃষ্টির মধ্যে। প্রকৃতির শান্ত পরিবেশ এবং বিশেষত সুদূর দিগন্তরেখার মধ্যে, মানুষ এমন কিছু পায় যা মানস প্রকৃতির মতোই অনিবার্যভাবে সুন্দর।" সম্ভবত এই কারণেই কেশবসুত প্রকৃতির কোলে বার বার তাঁর অন্তরের শান্তি খুঁজে পান। তাঁর 'সুদূরে নিঃসঙ্গ যাত্রী' কবিতায় তিনি লিখেছেন:

চলো বনে যাই একতারা নিয়ে হাতে
যে সুর হারালো খুঁজে দেখি তার রেশ।
রাতের স্বপন কত যে ভেঙেছে প্রাতে
কত না আশাই চিতায় হয়েছে শেষ।

কেশবসুতের কবিতায় প্রকৃতি কখনও পথনির্দেশ করেন, কখনও বা তিনি পথিকের বন্য সহচরী। পাশ্চাত্যে কবিতায় রক্তমাখা নখদন্তী মানুষের প্রতি মায়াহীনা যে প্রকৃতির রূপ দেখা যায়, তাঁর কবিতায় সেইরকম ভাব দেখা যায় না। তিনি তাঁর 'ঘূর্ণি হাওয়া' কবিতায় লিখেছেন :

ঘুরে ঘুরে যদি উড়ে উড়ে যাই
মিশে যদি যাই ঘূর্ণি হাওয়ায়
ঘুরপাকে উড়ে পরমানন্দে
মিলতেও পারি চেতনানন্দে।
কেন যে এখানে পড়ে থাকি মিছে
বয়ে গেছে কারো, টানবে যে পিছে!

'হারানো আদর্শ' নামে শেষ বয়সে রচিত তাঁর আত্মচিন্তামূলক কবিতায় যে গভীর হতাশার সুর লেগেছে তার অন্তর্নিহিত কারণ হল এই যে, প্রকৃতি থেকে আনন্দলাভের শক্তি তিনি হারিয়ে ফেলেছেন :

যেখানে রয়েছে নদী আর বন
সেখানে বসতি করে মোর মন।
সেথা যেন পাই তাঁর দরশন
যিনি মোর কাছে পরম রতন।
বারে বার তাই এ বিজন পথে
ঘুরে ফিরে আসি মোর মনোরথে।
বুঝিতে পারিনা কিভাবে কেমনে
পাই ও হারাই পরম রতনে।
ক্ষণে দেখি, ক্ষণে হারাই দরশ
দেখা যদি মিলে, না পাই পরশ।
কেঁদে কেঁদে ফিরি নদী আর বনে
পেয়ে হারায়েছি পরমরতনে।

এই সহজ আনন্দের স্বর্গ থেকে বিচ্যুতি কেশবসুতের পক্ষে মর্মান্তক হয়েছিল। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন বনে বনে কিংবা নদীর তীরে তীরে ঘুরতে ঘুরতে তিনি সেই অলৌকিক পুরুষকে হয়তো প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন যিনি মহতো মহীয়ান গরিয়সো গরীয়ান। ইংরেজ লেখক হ্যাজলিট-এর মতো তিনিও হয়তো বলতে পারতেন যে পাহাড়ের গা বেয়ে যেখানে মেঘ গড়িয়ে পড়ছে, সেখানে একবার ডুব দিতে পারলে ডুবসাঁতার

দিয়ে নির্ঘাত চলে যাওয়া যায় পূর্বজন্মের ছেলেবেলার খেলার আঙিনায়।

সংস্কৃত কাব্যের অনুসরণ করে, প্রচলিত মারাঠী কাব্যে প্রকৃতিকে ব্যবহার করা হত মানবলীলার পশ্চাদ্‌পট হিসাবে। এই পরম্পরাগত ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কেশবসুতের কাব্যের বিচার করা যায়, তাহলে দেখা যাবে তাঁর রোমাণ্টিক তন্ময়তা মারাঠী কাব্যে নূতন ভাব ও ভাষার আমদানী করেছিল। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে রেভারেণ্ড টিলককে বলা হত 'ফুল ও শিশুর কবি'। বালকবি ঠোম্বরে তো ছিলেন প্রকৃতিমায়ের কোলের সন্তান। কেশবসুতের উত্তরকালীন রোমাণ্টিক কবিদের মধ্যে সর্ব-প্রথম লক্ষ্যগোচর হয় মানুষ বনাম প্রকৃতির মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ। এইসব রোমাণ্টিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন গড়করি কিংবা "বী"। মরাঠী কাব্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার স্তরে প্রকৃতিকে স্থান দিয়েছিলেন কেশবসুত। তিনিই আবার প্রকৃতিকে পেঁাছে দিয়েছিলেন অতীন্দ্রিয়তার আধ্যাত্মিক রাজ্যে। মামুলি ধরনের ঋতু বর্ণনা কিংবা সকাল সন্ধ্যার খুঁটিনাটির সবিশেষ বিবরণের তুচ্ছতা থেকে, তিনি প্রকৃতিকে মুক্তি দিয়েছিলেন কল্পনার বিস্তীর্ণ লোকে। কেশবসুত সন্ধ্যার যে-ছবি এঁকেছেন তা থেকে আমাদের বক্তব্য হয়তো স্পষ্টতর হতে পারে :

সন্ধ্যা হল, সূর্য নামে আকাশের বুকে,
প্রখর চুম্বনে লাল নাচিছে লহরী,
মাটি 'পরে ঝরে ফুল মিলনের সুখে,
একাকার দুই দেহ উঠিছে শিহরি।
সন্ধ্যায় দিনের সাথে রাতের মিলন
প্রদোষেরে প্রেমিকেরা তাই ভালবাসে,
ঈর্ষা তায় করে নাকো এ বিরহী মন
ম্লানমুখে ঘোরে একা দূর পরবাসে।

'ঈশ্বর প্রকৃতির কবি', 'প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ'—এই সব প্রচলিত মনগড়া কথায় কেশবসুতের কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর জীবনে কখনও সৌভাগ্যের উদয় হয় নি, সুতরাং স্রষ্টাকে তিনি এত হৃদয়হীন বলে মনে করতে পারতেন না। কেশবসুতের অন্তরঙ্গ বন্ধু 'কিরাত' লিখেছেন : "তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল বলে মনে হয় না। দেখা যায় সম্প্রতি (কিরাতের এই প্রবন্ধ জানুয়ারি ১৯০৬ অব্দে 'মনোরঞ্জন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, কেশবসুতের শেষ জীবনে) তাঁর মতের কিছু পরিবর্তন হয়ে থাকবে। ইদানীং তিনি তাঁর চিঠিপত্রের শিরোনামায় 'শ্রীরাম' কথাটা লিখতে শুরু

করেছেন। একবার উনি আমায় বলেছিলেন আজকাল মাঝে মাঝে তিনি অন্তরের গভীরে এক রকম সংগীত শুনতে পান যা নাকি মধ্যযুগীয় ভক্তেরা শুনতে পেতেন। সেক্সপীয়র-এর 'পেরিক্লিস' নাটকেও এই ধরনের সংগীতের উল্লেখ আছে। আমি তখন তাঁকে বলেছিলাম, 'অন্তরের গভীরে এরকম সুর যদি শুনতে পেরে থাকো, তাহলে তো একদিন এই অনাহত ধ্বনি তোমায় জগদ্বিশ্বাসের পথে তুকারামের মতো সংসার বিরাগের পথে নিয়ে যাবে।' জবাবে কেশবসন্ত বলেছিলেন, 'তা যদি হয়, তাহলে এখন কবিতাকে যেমন প্রাণ ভরে ভালবাসি, ভগবানকেও সেইভাবে ভালবাসতে শিখব।' ”

কেশবসন্তের কবিতা পড়ে বুঝতে পারি সর্বত্র সর্বেশ্বরবাদীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তাঁকেও সেই দোটানার মধ্যে পড়তে হয়েছিল : পরমাত্মা যদি প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতযুক্ত থাকেন, যদি তিনি সর্বপ্রেমময় হন, তাহলে অস্তিত্বের মধ্যে এত দুঃখ কেন?' শংকরাচার্যের সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি মনে করা যায় যে বিশ্বচরাচর মায়া ছাড়া কিছু নয়, যদি এড্‌গার অ্যালান পো-এর কথামত ধরে নেওয়া যায় যে :

যা কিছু নেহারি, যাহা-কিছু দেখা যায়,
স্বপন মাঝারে যেন স্বপনের প্রায়।...

তাহলেও কোনো স্থিরনিশ্চিতির মধ্যে পৌঁছুনো যায় না। কবি যদি নাস্তিক হন তাহলে তাঁকে কালাপাহাড় হতে হয়, বিদ্রোহী হতে হয়। কেশবসন্তের মধ্যে এই কালাপাহাড়ি বিদ্রোহ কিছুটা ছিল। কিন্তু যে যুগে যে পরিবেশে তার জন্ম, তাঁর পক্ষে নীৎসে কিংবা মাইকোভস্কি হওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া কবি ছিলেন সহৃদয়, তাঁর মন ছিল সংবেদনশীল। সুতরাং তাঁর পক্ষে পুরোপুরি নাস্তিক হওয়া বা দুঃখবিলাসী হওয়া—দুটির কোনটাই সম্ভবপর ছিল না। মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁর অন্তরেও একটা অস্পষ্ট প্রত্যয় ছিল, তিনিও সম্ভবত বনবাণীর মধ্যে অনন্তস্বরূপের আহ্বান শুনে থাকবেন।

কেশবসুতের প্রেমের কবিতা

শ্রীআত্মারাম রাওজী দেশপাণ্ডে 'অনিল' নাগপুর থেকে প্রচারিত মারাঠী ভাষায় এক বেতার ভাষণে, কেশবসুতের প্রেমের কবিতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। তাঁর সেই ভাষণ থেকে কিছু উদ্ধৃতি এখানে তুলে দেওয়া হল :

"আমার বিশ্বাস মারাঠী ভাষায় যথার্থ প্রেমের কবিতা রচনার সূত্রপাত করেছিলেন কেশবসুত। বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হতে পারে তাঁর কবিতার সঙ্গে ইংরেজি প্রেমের কবিতার বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু এক হিসাবে কালিদাস, ভবভূতি-আদি সুপ্রসিদ্ধ ভারতীয় কবিদের বিশুদ্ধ প্রেমকাব্যের সঙ্গে মারাঠী কাব্যের একটি ধারাবাহী যোগ তিনিই স্থাপন করে গিয়েছিলেন। মাঝখানে মধ্যযুগে বহু শতাব্দী ধরে ভারতের সমাজব্যবস্থা মুহ্যমান অবস্থায় দিন যাপন করেছে। যুবক যুবতীর প্রকৃতিসিদ্ধ প্রেম সম্বন্ধ, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ বিকর্ষণ, মিলন বিরহ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপার ভদ্রসমাজ থেকে একপ্রকার বহিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মানুষের ব্যক্তি মাহাত্ম্য ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হবার ফলে, অচলায়তন সমাজের ভিত নড়ে যায় এবং সমাজ জীবনে নরনারীর প্রেম সম্বন্ধ পুনরায় প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে। বলা চলে যে কেশবসুতের প্রেম-কবিতা আধুনিক কাব্যের ঊষাসূক্ত।

"তাঁর লেখা প্রথম প্রেম-কবিতা 'প্রিয়াকে মনে পড়া'-য় কবি তাঁর আপন কথা বলেছেন। পত্নীকে তিনি বসিয়েছেন প্রেয়সীর আসনে। আবার মানস সুন্দরীর প্রতি আদর্শ প্রেমের স্পন্দন দেখা যায় তাঁর জাহাজের রেলিঙ্-এর পাশে প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণরতা তরুণীকে উদ্দেশ করে লেখা একটি কবিতায় :

> দোঁহার প্রণয় যদি বা গভীর হয়
> তুমি হবে প্রিয়া আমি প্রিয় নিশ্চয়।
> অথবা আমিই হব রমণীর মতো
> তুমি সখা হয়ে সোহাগে বাঁধিবে কত।

"কেশবসুতের প্রেমের কবিতায়—তা সে দাম্পত্য প্রেমই হোক কিংবা মানসী প্রিয়ার প্রেমই হোক—একটা বিমূর্ত ও দেহাতীত ভাব দেখা যায়।

তাঁর আর একটি কবিতায় দেখি বন্ধু কবিকে বলছেন, 'চলো, এগিয়ে যাই'। কবির কিন্তু পা সরে না। তখন

কবিরে ডেকে শুধায় সখা
'কেন তোমার মন,
গভীর মনোগহন মাঝে
সদাই নিমগন?'
সখার পানে চাহিয়া কবি
ঈষৎ হাসি বলে,
'খুঁজিয়া দেখো জবাব পাবে
আপন হৃদিতলে।'
শুধায় সখা 'তবে কি কবি
তোমার গীতিছন্দে,
জড়ায়ে গেছে চরণ দুটি
কঠিন দৃঢ় বন্ধে?'
আবার হেসে কহিল কবি
'প্রেমের বাঁধনটারে
হারের মতো গলায় পরি
চরণ ছাড়ে না রে।'"

'প্রেম এবং তুমি' কবিতায় কেশবসুত কবুল করেছেন 'আমি প্রেম ও তোমা বই আর কিছু জানি না':

দূরে যদি যাও, পর হয়ে যাও সই,
কবি জানবে না প্রেম আর তোমা বই।

রুষ্ট সুন্দরীকে উদ্দেশ করে বলেছেন :

চক্ষে তোমার অগ্নি যখন ঝলকে
বাঁচিবার সাধ ঘুচে যায় মোর পলকে।

প্রেমের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

কেমনে বাঁধিব এ দুটি বাহুর বাঁধনে
যা আছে মনের গভীর গোপন সাধনে।

কেশবসুতের প্রেমের কবিতায় এমন একটি ফল্গুধারা রয়েছে, যার উৎস সন্ধান করে মেলেনা অথচ যার আকর্ষণ দুর্নিবার। বোদলেয়র-এর কবিতার মতো তাঁর প্রেমের কবিতার বিহারক্ষেত্র হল স্বপ্নলোক; সেখানে কীটস্-এর অনুভূতিপরায়ণতা নেই, বায়রণ-এর মতো রক্তমাংসের উন্দীপনা নেই। দেশপাণ্ডে কেশবসুতের অতীন্দ্রিয়বাদকে বলেছেন 'রোমাণ্টিক ভাবের

নব্য অতীন্দ্রিয়বাদ' কারণ তাঁর কবিতায় 'অদেখা অজানা' নিয়ে তিনি উচ্ছ্বাস করেন নি। আচার্য স. জ. ভাগবত বলেছেন কেশবসুত সেই শ্রেণীর কবি-দার্শনিক যাঁরা জীবনের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন ও জীবন বিষয়ে তাঁদের অনুভব অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে বিচার করেছেন।

কেশবসুতের সমগ্র কাব্যরচনায় তৃতীয়াংশ হল প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ বিষয়ে। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে তার এই প্রেম ছিল মুখ্যত দেহাতীত। চুম্বন আলিঙ্গনাদির উল্লেখ নেই বললেই চলে। সংস্কৃত কাব্যে শৃংগার রসের প্রাধান্য কতখানি সে তো সকলেই জানেন। প্রাক-কেশবসুত যুগের মারাঠী লোককাব্যের যে-অংশ 'লাবণী' নামে খ্যাত, কামলিপ্সা তার প্রধান উপাদান। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেশবসুতের বিমূর্ত প্রেম একটা আশ্চর্য ঘটনা বলে মনে হয়। মধুর বেদনার মেঘে ঢাকা আকাশে তাঁর প্রেমের কবিতার প্রকাশ যেন সাতরঙা রামধনুর মতো। তাঁর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল এই যে প্রেম হল দেবতার দান, প্রেম স্বর্গীয়। স্বর্গ হতে খসে পড়া বীজ আমাদের হৃদয়ের প্রতীক্ষমান ক্ষেত্রে ফুল হয়ে ফোটে, আর সেই ফুলের মালা আমরা প্রিয়ার গলায় পরাই। প্রেম থেকে প্রেমের জন্ম। হাটেবাজারে প্রেম খরিদ করা যায় না, পণ্যবস্তু নয় যে প্রেম নিয়ে বেচাকেনা করা যায়। নিজের অজান্তে কেশবসুত যেন কবীরের একটি দোহার প্রতি-ধ্বনি তুলেছেন। কবীর বলেছেন :

এ ফুল ফোটে না বনে
হাটে না বিকায়
নতশিরে চাহে যারা
প্রেম তারা পায়।

কেশবসুতের কাছে প্রণয়ের ভাষা হল ফুলের ভাষা। প্রিয়া যদি সঙ্গে থাকেন তা হলে অরণ্যও তাঁর কাছে ফুলের বাগান। তাঁর 'সমৃদ্ধি ও প্রেম' শীর্ষক কবিতায় তিনি বলেছেন :

বন কেটে বসত করি
বাঘসিংহে থোড়াই ডরি।
গড় বাজাব শক্ত করে
পরাণ দিব তোমার তরে।
লতা যেমন গাছের বুকে
লগ্ন হয়ে রইবে সুখে।
এমনি করে দিন যদি যায়
জাহান্নমেও স্বর্গ ঘনায়!

কেশবসুতের কাছে প্রেম হল যেন বস্তুসম্বন্ধ-বিরহিত রোমাণ্টিক স্বপ্ন-বিশেষ, প্রেম হল প্রেয়সীর হাতে নিবেদিত সেই ফুলের অর্ঘ্য যার অম্লান স্মৃতি অনেক দোষত্রুটিকে ক্ষমা দিয়ে ঢাকা। প্রেমের অন্তরে যে বিচিত্র অনুরণন আছে, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে তিনি তা প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর প্রেমের কবিত্যাকে তিনি প্রেয়সী ও প্রেমিকের মধ্যে কেবল নিবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর কবিতার বিষয়ভুক্ত হয়েছে শিশু, তারা, শিশির বিন্দু, পুরাতন স্মৃতি, সন্ধ্যার রক্ত রাগ, গোলাপকলি,—এমন কি, লী হাণ্ট্-এর জেনী।

কেশবসুতের প্রেমের কবিতায় একটা দুঃখবেদনার ভাব প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে। মনে হয় প্রথম যৌবনে প্রণয়ের ব্যাপারে তাঁর আশাভঙ্গ হয়ে থাকবে। মিলনের আনন্দের চেয়ে বিরহের বেদনাকেই তিনি যেন বেশি করে দেখিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁর রচিত 'পেঁচা' কবিতার উল্লেখ করা যায়। কবিতাটি যদিও এডগার অ্যালান পো-রচিত 'দাঁড়কাক' কবিতার ভিত্তিতে লেখা, তবু এর মধ্যে এমন কয়েকটি ভাব আছে যা নিশ্চিতভাবে কেশবসুতের নিজস্ব।

যারে যা পেঁচা রে চলে,
কাঁদিয়া ভাসাই,
বুকে শোক কী উথলে
কাহারে জানাই।
অকরুণ তোর গানে
জ্বালা ধরে দুই কানে
বিষাদের বোঝা আমি
নামাব কোথায়।
যত করি আহা উহু
ঘাড় নাড়ি কহে উঁহু
কালা মুখ কালপেঁচা
বসে জানালায়।
এ পেঁচা আমারে ছাড়ি
যাবেনাকো আন বাড়ি
মাথা কুটে মরি শুধু
মিছা হতাশায়।

কেশবসুত তাঁর আর এক কবিতায় শাজাহানের দুই কীর্তি ময়ূর সিংহাসন ও তাজমহলের মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে বলেছেন যে একটি নিতান্তই

ঐশ্বর্য বৈভবের স্থূল প্রকাশ ও অন্যটি হল গভীর প্রেমের প্রতীকরূপ। এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টি যে তিনি বেশী পছন্দ করতেন, সে তো জানা কথা। মূল সনেটটি লিখেছিলেন ১৮৯২ অব্দের ১৩ নভেম্বর তারিখে। কবিতার মর্মার্থ এই রকম :

দুটি ভালো কাজ করেছিল বটে সম্রাট শাজাহান
ছ'কোটি টাকায় ময়ূর-আসন করেছিল নির্মাণ।
দণ্ডমুণ্ড বিধাতা যখন বসত দেওয়ান-ই-খাসে
আমীর-ওমরা হাত জোড় করে কাঁপত ভয়ে ও ত্রাসে।

প্রেয়সীর স্মৃতি রেখেছিল ধরে মর্মর মন্দিরে
তিন কোটি টাকা খরচে আর এক কীর্তি যমুনা তীরে।
শোনা যায় নাকি লুট হয়ে গেছে ময়ূর সিংহাসন
লুটেরা কালেরে ফাঁকি দিয়ে তাজ আজিও চিরন্তন।

ভ্রান্ত মানব কীর্তিকলাপে অমরতা পেতে চায়
স্বার্থের বেদী সাজায়ে যতনে ভস্মেতে ঢালে ছাই।
যত ধূপ জ্বালে ধোঁয়া জমে তত তবু না ক্ষান্তি মানে
উপচারে খুশি নয় মহাকাল, সে কথা কি নাহি জানে?

জানেনা তাজের শিয়রে জ্বালানো একটি আগর বাতি
গন্ধেতে তার বিশ্বহৃদয় চিরকাল রবে মাতি?

মারাঠী ভাষায় প্রেমের কবিতায় কেশবসুত আর এক দিক থেকেও অগ্রণী। প্রেমের বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সংকোচ ছিল না—না ভাবে, না ভাষায়। নারীদেহের প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের কথা তিনি বেশ খোলা-খুলিভাবে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কেশবসুতের পূর্ববর্তী যুগে হয় আভাসে ইংগিতে অলংকৃত ভাষায়, নতুবা শ্লীলতাহীন বাজারে খিস্তির ভাষায় স্ত্রীপুরুষের দৈহিক সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা থাকত। প্রেমের কবিতায় একটি সুকুমার লিরিক ভাবের আমদানী তিনিই করেন। দূর-সংস্থিত প্রণয়ীজনের স্মরণে তাঁর কয়েকটি কবিতা, আধুনিক মারাঠী কবিতায় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে।

১৯৬৬ অব্দের ২৭ মার্চ তারিখে মুম্বই মারাঠী গ্রন্থ সংগ্রহশালায় একটি বক্তৃতা দিতে গিয়ে শ্রীমতী চারুশীলা গুপ্তে বলেছিলেন, যদি কেশবসুত 'নয়া সিপাহী', 'তূর্য' আর 'স্ফূর্তি' নামে তিনটি কবিতা ছাড়া আর কিছু না-ও লিখতেন তবু তিনি অমর হয়ে থাকতেন। তাঁর মতে এই তিনটি কবিতা হল আধুনিক মহারাষ্ট্রের তিনটি নব সংহিতা। নিঃসংশয়ে বলা চলে এই তিনটি কবিতায় (পরিশিষ্টে এদের অনুবাদ দেওয়া হল) এমন একটি শক্তি আছে, পুরাতন ও গতানুগতিকের বিরুদ্ধে এমন একটি বিদ্রোহ আছে, যা মারাঠী কাব্যসাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি। এই কবিতাত্রয় থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে কেশবসুত ছিলেন মানবতাবাদের সদাজাগ্রত প্রহরী। তিনি ছিলেন জীর্ণ রীতিনীতি ও মরচে-পড়া সংস্কারের ঘোরতর বিরোধী। জাতি, বর্ণ বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে মানুষে মানুষের পার্থক্যের প্রাচীর গড়ে উঠবে—এই ভেদভাব মানতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা দেখি তাহলে তাঁর এই সাম্যভাবের তাৎপর্য আমরা হয়তো বুঝতে পারব।

১৮৫৭ অব্দে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতে যে স্বতঃবৃত্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল, তার এক দশক পরে কেশবসুতের জন্ম। ততদিনে ভারতের লোকে বুঝতে পেরেছে এ দেশে ইংরেজ শাসন ভগবৎ-প্রত্যাদিষ্ট নয়। পর পর কয়েকটি আন্দোলনের ফলে মহারাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যেও দাসত্ব-শৃঙ্খল মোচন করার জন্য একটি চেতনা জেগেছিল। কেশবসুত লেখাপড়ার জন্য যখন পুণায় আসেন তখন সেখানকার আবহাওয়ার মধ্যে ছিল শত কণ্ঠের অব্যক্ত জিগির 'আমার দেশ, আমার ধর্ম, আমার ভাষা।' তাঁর পরিগ্রহণশীল মনে এই সব ঘটনা গভীর প্রভাব বিস্তার করে।

তাঁর অধিকাংশ দেশাত্মবোধক কবিতা রচিত হয় ১৮৯০ অব্দের আগে। তারপর থেকে তাঁর জীবনে কিংবা সাহিত্যে রাজনীতির কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দেখা যায় না। অথচ ওই সময়েই মহারাষ্ট্রের কবি ও মনীষীরা ইতিহাসের নজির তুলে স্বদেশের প্রাচীন গৌরব নিয়ে অজস্র লেখা লিখে চলেছেন। অতীতের ধুয়ো তুলে কেশবসুত আত্মপ্রবঞ্চনা করতে চান নি। নিজের সমসাময়িক সমাজে মানুষে মানুষে বৈষম্য দেখে তিনি এতই বেদনা ও আঘাত পেয়েছিলেন যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি অসাম্যের অবিচারের বিরুদ্ধে লড়ে গিয়েছেন।

কেশবসুত কি পরিবর্তনের কবি ছিলেন না বিবর্তনের, তিনি ভাঙার দিকে ছিলেন না গড়ার দিকে—এই নিয়ে মারাঠী সমালোচক মহলে মতদ্বৈধ দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেছেন তিনি অনাগত কালের পুরোধা; পটবর্ধনের মতো কেউ বলেছেন যুগের ধর্মে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন মাত্র, যুগপ্রবর্তক তিনি ছিলেন না, আবার কারও কারও মতে তিনি ছিলেন নিতান্তই সমাজসংস্কারক। যদিও কেশবসুত তাঁর কবিতায় স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রাত্রের জয়গান গেয়েছেন, তাঁকে ঠিক রাজনীতিক কবি বলা চলে না। আপন পরিবেশের সঙ্গে তাঁর বনিবনা ছিল না। তিনি খুব ভালো করেই জানতেন কবি হিসাবে সমাজের উপর তাঁর প্রভাব ছিল নিতান্তই দুর্বল ও অপ্রত্যক্ষ।

প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি সর্বপ্রথম দাঁড়ান দেশের শিক্ষা-পদ্ধতির সমালোচনা করতে গিয়ে। এই পদ্ধতির মূল কথাটা ছিল 'বেত্র যদি না রয় হাতে, ছাত্র যাবে অধঃপাতে।' ১৮৮৯ অব্দে এপ্রিল মাসে, ছাত্রকে প্রহাররত এক শিক্ষকের প্রতি তাঁর তীব্র বিক্ষোভে ও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি একটি চতুর্দশপদী কবিতায় বলেছিলেন :

কোন পাপে তুই পিটাস এসব নিষ্পাপ বাছাদের,
আহাম্মকির দৌলতে তুই শিক্ষক হলি ভাই,
এর চেয়ে ঢের ভাল হ'ত তোর নিলে পেশা কসায়ের,
সে কাজ তোকে যে মানাত ভালই তাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিষয়ে তাঁর মনে প্রচুর তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল। তাই তিনি এদের বিরুদ্ধে লিখতে ইতস্ততঃ করেন নি।

সমসাময়িক ভারতের দুরবস্থা নিয়েও তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন। ১৮৮৬ অব্দে 'জনৈক ভারতবাসীর উক্তি'—নাম দিয়ে তিনি একটি কবিতায় লিখেছিলেন :

ভারত গৌরব রবি অপূর্ব কিরণে
উঠেছিল একদিন এ পূর্ব গগনে।
সে সূর্য ভ্রমণে গেল পশ্চিমের তটে
অন্ধকার নেমে এল দিনান্তের পটে।
পুষ্পিতলতায় দেখো, কিবা মনোলোভা
দাসত্বের চোখে তার নাহি দেখি শোভা।
কী মধুর সুরে পাখি গাহে তার গান
সে সুর শোনে না হায় দাসত্বের কান।

দীর্ঘ কবিতায় পরাধীনতার দুঃখ বর্ণনা করতে গিয়ে শেষ কয় পংক্তিতে লিখেছেন :

কভু কি হবে না ভোর দাসত্বের রাতি
ভানুতে দেখিব পুন ভারতের ভাতি।
কভু কি টুটিবে হায় অন্ধ কারাগার
ভারত ফিরিয়া পাবে নিজ অধিকার?

তখন কবি স্বপ্নেও ভাবেন নি এই কবিতা রচনার ৭১ বছর পরে—তাঁর স্বপ্ন সত্য হবে।

অপর একটি তাৎপর্যপূর্ণ কবিতায় তিনি পল্লীজীবনের সরল সৌন্দর্যের অবতারণা করতে গিয়ে বলেছেন দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ যেন তার চিত্তের সন্তোষ না হারায়, যেন পশ্চিমের চোখ-ধাঁধানো সভ্যতার মোহে তার পল্লীগ্রামের স্বদেশকে ভুলে না যায়। ১৮৮৭ অব্দে রচিত 'একটি গ্রাম'—নামে কবিতায় তিনি লিখেছেন :

নাইবা রইল এ গাঁয়ে মোদের হর্ম্য প্রাসাদসম
আধিব্যাধি যেথা আরামে বসত করে।
শান্তির নীড় দীনের কুটীর দেখো কিবা মনোরম
যাদুগুণে সেথা রোগের বালাই মরে।
জানো তো রোগেরা আয়েশী বেজায় বিলাসী বাবুর মতো
তাকিয়া ফরাশে হয়ে থাকে গদীয়ান,
দড়ির খাটিয়া, কুটকুট করে কালো কম্বল যত
সেখানে শয়ন রীতিমতো অপমান।
আমাদের গাঁয়ে নিভৃত কুটীরে চাষাভূষাদের বাস
হালে ও লাঙলে চাষবাস করে তারা,
ক্ষেতে ও খামারে কাজ করে যারা বছরের বারোমাস
সোজা বাড়ি ফেরে দিনমান হলে সারা।
এ-গাঁয়ে যদি রে মিলত আমার ছোট একখানি বাসা
সুখেভরা এক মনের মতন ঠাঁই,
চাষা হয়ে হেথা গতর খাটিয়ে কাটত যে দিন খাসা
ফসল ফলানো—তার বড়ো সুখ নাই।
সোনার ফসলে হয়ে যেত মোর সকল দৈন্য দূর
লেখাপড়া নিয়ে দিতনাকো কেউ গাল,
স্বর্গের সুখে মর্ত্য আমার হয়ে যেত ভরপুর
কভু না হতাম নাম নিয়ে নাজেহাল।

নাম সে তো স্রেফ পাখির পালক—শিরোভূষণের টুপি
আদরে মাথায় পরুক না নামী জন,
যে-পাখি ঘায়েল করেছে শিকারী চুরি করে চুপি চুপি
সে পাখা খসিতে লাগে রে কতক্ষণ?
এ দীন ভবনে বিদেশী অতিথি আসিলে যতন ভরে
অতিথির সেবা স্বাগত বচনে করি,
দূরের পথিক আপন দেশের কত যে গল্প করে
শুনে শুনে আমি ভয়ে বিস্ময়ে মরি।
বিশ্ব এমন বিপুল বিরাট কত সুন্দর শোভা
কত পথ ঘাট, কত না নগর নদী,
কত বিচিত্র দৃশ্য রয়েছে মানুষের মনোলোভা
অজানা রহিত নাহি জানিতাম যদি।
তবু বলিব না কভু জেনো আমি আমার স্বদেশ ছেড়ে
বিদেশের পথে জমাব আমার পাড়ি,
দেবতারা সব স্বর্গে আছেন, থাকুন সেথায় বেড়ে
মর্ত্য-মাতারে তাই বলে যাব ছাড়ি?

এই কবিতার মধ্যে গোল্‌ডস্মিথ-এর 'দি ডেজার্টেড ভিলেজ' ও ওয়ার্ড-স্বার্থ-এর 'দি প্রেলুড'-এর সরল ভাবাবেগের সঙ্গে মিশেছে কবির অন্তরাশ্রিত দেশপ্রেম।

আধুনিক যুগে মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক জাগরণের দার্শনিক পটভূমিকা বিষয়ে বলতে গিয়ে দিনকর কেশব বেডেকর লিখেছেন: "রাণাডে ও আগর-করের মধ্যে একটা মস্ত বড় পার্থক্য ছিল। আগরকরের প্রকৃতিপ্রেমে এমন একটা গভীরতা আছে, যা প্রাচীন বা অর্বাচীন কোনো দার্শনিকের মধ্যে দেখা যায় না—এমন কি রাণাডের রচনাতেও তা অনুপস্থিত। প্রকৃতির প্রতি এইরকম প্রেম-উন্মাদনা দেখা যায় কেশবসুতের কাব্যে ও পরবর্তী যুগে আরও ঘনীভূত অবস্থায় বালকবির (১৮৮৯—১৯১৮) রচনায়। মহারাষ্ট্রীয় কাব্যে দর্শনের প্রভাব বিচার করতে গিয়ে এই তথ্যটি স্মরণ-যোগ্য। আগরকরের 'প্রকৃতি নিরীক্ষণ' প্রবন্ধটি মন দিয়ে পড়লে এ-থেকে অনেক কিছু জানা যাবে।"*

মনে হয় এই প্রকার প্রকৃতিপ্রেমই সূচিত করেছে গান্ধীজীর গ্রামে যাবার ডাক, যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ফিরে চল মাটির টানে' এবং যার

*মহারাষ্ট্র জীবন : সম্পাদক : গং০ বা০ সরদার, পৃঃ ৬০।

বিষয়ে হালী তাঁর বিখ্যাত কবিতায় লিখেছেন 'ওকতা গয়া হুঁ যা রষ দুনিয়া কী শোরিশোঁ-সে'—

নগরের কোলাহলে ক্লান্ত
গ্রামে যাই, সেথা সব শান্ত।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে ভারতের অধিকাংশ কবিই এই রকম এক একটি শান্তির নীড় সন্ধান করে চলেছিলেন—যেখানে চিত্তের একটা সান্ত্বনার আশ্রয় মিলবে। এক হিসাবে একে বলা যায় 'রোমাণ্টিক পলায়নবাদ'। কিন্তু অলডাস্ হক্সলি তাঁর 'এণ্ড্স এণ্ড মিন্স' গ্রন্থে বলেছেন 'প্রত্যেক মুক্তিই একপ্রকার পূর্তি বিশেষ।'

কেশবসুতের মধ্যে নগরীকরণ ও সামন্ত ব্যবস্থার বিলুপ্তিসাধন বিষয়ে একটা সচেতনতা দেখা যায়। 'তূর্য' কবিতার দুটি পাণ্ডুলিপি ভালো করে অনুধাবন করলে তা থেকে দুটি প্রসঙ্গ বেশ স্পষ্ট হয়। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় স্ত্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ, বিধবার মস্তকমুণ্ডন, বিধবার পুনর্বিবাহ ও অস্পৃশ্যতা নিবারণের প্রসঙ্গ তুলে তাঁর বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হয়েছে। সংশোধিত দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায় এই সব সমস্যার সোজাসুজি উল্লেখ থেকে তিনি বিরত থেকেছেন। উপদেশাত্মক ও নীতিপ্রধান হলেও দ্বিতীয় খসড়াকে আর সমাজসংস্কারবিষয়ক পদ্য-নিবন্ধ বলা চলে না। ডাঃ শ্রীঃ পণ্ডিত লিখেছেন: "কেশবসুতের মজদুর লাল কমরেড নয়। ১৮৮৯ অব্দে তিনি যখন এ কবিতা লেখেন, তখনও পর্যন্ত কার্ল মার্ক্স-এর নাম এদেশে এসে পেঁছায় নি।" সুতরাং বলা যায় যে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের জন্য কেশবসুতের মনের মধ্যে একটি মৌল তাগিদ ছিল যা নাকি তাঁর সমাজসংস্কারবিষয়ক কবিতায় মূর্ত হয়েছে। কবিরূপে তাঁর প্রাথমিক আনুগত্য ছিল নান্দনিক ও কাব্যিক আদর্শের প্রতি। কিন্তু এ দেশের নাগরিক ও সাধারণ লোক-হিসাবেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার দায়িত্ব তিনি এড়িয়ে যান নি। তিনি যে অন্ধ গোঁড়ামি থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন ও বিশেষ কোনো রাজনীতিক মতবাদের ফাঁদে পা দেন নি—এটা অবশ্যই শ্লাঘার যোগ্য। যাকে 'রাষ্ট্রিক' কিংবা 'দেশাত্মবোধক' বলা চলে, তেমন কোনো কবিতা লেখার প্রলোভন থেকেও তিনি নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন যদিচ তেমন কবিতা লিখলে হয়তো তিনি সহজেই জনপ্রিয় হতে পারতেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠাও হয়তো অর্জন করতে পারতেন। তাঁর কাব্যভারতীর প্রতি তিনি যে একনিষ্ঠা দেখিয়েছেন তা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়।

অনুবাদ

পাশ্চাত্য সাহিত্যের কাব্যরূপ থেকে কেশবসুত কেবল যে গীতিকবিতা, গাথা কবিতা, চতুর্দশপদী প্রভৃতির কাঠামো নমুনা হিসাবে নিয়েছিলেন এমন নয়, তিনি অনেক সময় ইংরেজি বাক্যাংশ কিংবা পুরোপুরি পদেরও আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন, যেমন 'মুখের ভাব পড়া' অথবা 'মানুষ মানুষের কি দশা ঘটিয়েছে' ইত্যাদি। সর্বসাকুল্যে তিনি যে ১৩২টি কবিতা রেখে গেছেন তা থেকে ২৫টি-ই অনুবাদ—সংস্কৃত থেকে ৪টি, অন্যগুলি ইংরেজী থেকে।

সংস্কৃত থেকে তিনি যেসব অনুবাদ করেছেন তার মধ্যে কবির কোনো মৌলিকতা বা বিশেষ প্রতিভার নিদর্শন দেখা যায় না। মনে হয় এগুলি যেন পদ্যবদ্ধ রচনায় বুদ্ধির ব্যায়াম। রঘুবংশ সপ্তম সর্গের পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্লোক অবধি মারাঠীতে অনুবাদ করে কেশবসুত তাঁর কাব্যজীবন শুরু করেন। সেই সময় গণেশশাস্ত্রী লেলে-কৃত সম্পূর্ণ রঘুবংশের পদ্যানুবাদ বাজারে পাওয়া যেত। কেশবসুতের অনুবাদে দেখা যায় মূল সংস্কৃতের মর্মার্থ তিনি কোথাও কোথাও ঠিক ধরতে পারেন নি, কোথাও কোথাও আবার নিজেই অর্থ আরোপ করেছেন। তাঁর দ্বিতীয় অনুবাদ হল ভারবির কিরাতার্জুনীয়ম্ প্রথম সর্গ থেকে ২৬টি শ্লোকের। প্রথমের তুলনায় দ্বিতীয় অনুবাদে কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ দেখা যায়। সংস্কৃত-সুভাষিত থেকে তিনি দুটি শ্লোক অনুবাদ করেছিলেন, তার মধ্যে একটি ছিল হাস্যরসের।

ইংরেজী থেকে অনুবাদের মধ্যে দুটি ছিল সনেট : উইলিয়ম ড্রামণ্ড-এর 'দুনিয়া কি তা হলে এইভাবে চলবে' (Doth then the world go thus?) এবং 'প্রকৃতির পাঠ' (The Lessons of Nature); এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ-এর 'কর্ম' (Work) এবং শেক্সপীয়রের তিনটি সনেট 'অন্ধ প্রেম' (Blind Love), 'পিতল নয়, পাথর নয়' (Since brass, nor stone) এবং 'মরণান্তিক' (Post Mortem); অন্য কবিতার মধ্যে ছিল টমাস হুড্-এর 'মৃত্যুশয্যা' (The Death-bed), এডগার অ্যালান পো-এর 'স্বপ্নের স্বপ্ন' (Dream within a Dream), এমার্সন-এর 'ক্ষমা' (The Apology), স্কট্-এর 'হাজেলডিনের জোক' (Jock of Hazeldean), জন লাইলি-এর 'কিউপিড ও কাম্পাস্পে' (Cupid and Campaspe) এবং লে হন্ট্-এর 'রন্দো' (Rondeau)। য়ুরোপীয় কবিদের তিনটি কবিতা

ইংরেজী ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে কেশবসুত মারাঠীতে অনুবাদ করেছিলেন : গ্যেটে-এর 'প্রান্তরের একটি ছোট গোলাপ' (A little Rose on the Heath), তেওফিল গোতিয়ের-এর 'তুষারধবল প্রজাপতি' (The Butterflies as White as Snow) ও ভিক্তর উগো-র 'ছোট নেপোলিয়ন' (Napoleon le Petit)। শেষোক্ত দুটি তরু দত্তের ইংরেজী অনুবাদের ভিত্তিতে কেশবসুত মারাঠীতে অনুবাদ করেছিলেন।

এ ছাড়া আর যে-তিনটি কবিতা ছিল তাদের ঠিক অনুবাদ বলা চলে না, বলা যায় মূলের ছায়া অবলম্বনে রূপান্তর। এগুলি হল : লংফেলোর 'সিঁড়ির মাথায় পুরনো ঘড়ি' (The Old Clock on the Stairs), পো-রচিত 'দাঁড়কাক' (Raven) ও কোলরিজ্-এর 'আলেকজান্দারের ভোজসভা অথবা সংগীতের মায়া' (Alexander's Feast or the Power of Music)। এ-সব নবসৃষ্ট কবিতায় মূলের ভাব ও গঠন অবিকৃত রক্ষিত হয়েছে, কিন্তু ছন্দ ও পরিবেশ আমূল পরিবর্তিত।

ডাঃ মাধবরাও পটবর্ধন ও প্রফেসর রাং শ্রীং জোগ প্রভৃতি সমালোচকের মতে এই সব অনুবাদের প্রত্যেকটিই উৎকৃষ্ট বা উচ্চস্তরের নয়। এই অনুবাদ থেকে কেবল এই কথাই প্রমাণ হয় যে শুধু পশ্চিমের বিচারধারা সর্বভূতাত্মিক বিশ্বাস ও মানবিক উদারতা দ্বারাই যে মারাঠী কাব্য প্রভাবিত হয়েছিল এমন নয়—বরঞ্চ মারাঠী ভাষায় যে-সব কাব্যরূপ অপরিচিত ছিল, সেগুলিকে আত্মসাৎ করার ফলে ভাবের দিক থেকে ততটা না হলেও, গঠনের দিক থেকে বৈচিত্র্যের আমদানী ঘটেছিল। মারাঠী ভাষায় কেশবসুত যে চতুর্দশপদীর প্রচলন করেছিলেন, তার প্রভাব নিঃসন্দেহে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর রচিত প্রথম চতুর্দশপদীর নাম ছিল 'ময়ূরাসন ও তাজমহল'। ১৮৯২ অব্দের ১৩ নভেম্বর তারিখে রচিত হলেও এটি 'করমণুক' পত্রিকায় ছাপা হয় পরবর্তী বছরের ১৩ মে তারিখে। গোড়ায় এই কাব্যরূপের নাম দেওয়া হয়েছিল 'চতুর্দশক' বা 'চতুর্দশপদী', পরে এর নাম হয় 'সুনীত'। 'দুর্মুখ' নামে কবিতাটিকে যদিচ 'সুনীত' বলা হয়েছিল, এর পংক্তি সংখ্যা হল চোদ্দর জায়গায় ষোলো। কেশবসুত কেবল সেক্সপীয়র-এর নয়, মিল্টন-এর সনেট্-রূপকেও ব্যবহার করেছেন—মূলের অন্ত্য মিল প্রয়োগের ধাঁচা অক্ষুণ্ণ রেখে। গোড়ায়, তিনি প্রথম বারো পংক্তিতে একরকম ধরনের ছন্দ ও মিল রেখে, শেষের দুই পংক্তিতে ভিন্ন ধরনের ছন্দ ও মিলের প্রয়োগ করতেন। পরে কিন্তু ছন্দে ও মিলের দিক থেকে মূল সনেটের রূপকল্প তিনি অবিকৃত রেখেছেন।

কেশবসুতের অনুবাদ থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে তাঁর মধ্যে কোনো কাব্যিক গোঁড়ামি বা শুচিবায়ু ছিল না। বিদেশের কাছ থেকে কাব্যের

রূপকল্প তিনি যেমন স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছেন, তেমনি বিদেশী ছন্দ আত্মসাৎ করতেও কোনো দ্বিধাবোধ করেন নি। তাঁর কল্যাণে মারাঠী কাব্যে সেই যে সনেটের ছন্দোবদ্ধ রূপকল্প একবার গৃহীত হয়েছিল, তার পর থেকে তা ওই কাব্যে অঙ্গাঙ্গীযুক্ত হয়ে গেছে। কেশবসুত গত হবার পরেও কয়েকজন মারাঠী কবি সনেট-আকারে কবিতা তো লিখেছেনই, কেউ কেউ আবার একটির পর একটি সনেট জুড়ে জুড়ে খণ্ডকাব্য রচনাতেও হাত লাগিয়েছেন। পাশ্চাত্য কাব্যরূপ থেকে তিনি যেমন গাথা কবিতা বা চতুর্দশপদীর আমদানী করেছিলেন, তেমনি করেছিলেন 'স্কাইলার্ক'-জাতীয়-উৎপ্রেক্ষাবহুল গীতিকবিতার। এজন্য কাউকে যদি অভিনন্দিত করতে হয় তবে সে-অভিনন্দনের যোগ্য হলেন কেশবসুত, কারণ তিনিই এদিক থেকে মারাঠী কাব্যের প্রথম পথপ্রদর্শক। যা তিনি ইংরেজী কাব্যের প্রতি তাঁর সত্যকার অনুরাগবশতঃ কিম্বা অন্যবিধ প্রেরণায় করেছিলেন, আজ তা অনেক কবি অনুকরণ-যোগ্য 'ফ্যাশন' বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

অভিনবত্ব

ভাষা, ছন্দ অথবা রচনাশৈলী নিয়ে যে-কবি সফল পরীক্ষা করেন নি, তাঁকে কেউ শ্রেষ্ঠ কবি বলে না। প্রফেসর জোগ কেশবসুতের রচনার ভাষা, ছন্দ ও প্রয়োগনৈপুণ্য নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে কেশবসুত অক্ষরাবৃত্ত ছন্দের চেয়ে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ পছন্দ করতেন বেশী। পুরাতন কালে মারাঠী কাব্যে কেবল পয়ার ও চৌপদীর চল ছিল। কেশবসুত সেই রীতি অতিক্রম করে পাঁচ, ছয় কিংবা সাত পংক্তির ছন্দ প্রবর্তন করলেন। একই স্তবকে তিনি হ্রস্ব দীর্ঘ ছত্র লিখতে ইতস্ততঃ করতেন না। হিন্দী কাব্যে যে-দোহা ছন্দ আছে, মধ্যযুগীয় মারাঠী কবি মোরোপন্তের পর আর কেউ সেই ছন্দে কাব্য রচনা করেন নি। কেশবসুত এই ছন্দের পুনঃ প্রবর্তন করেন। তিনি প্রায় মুক্ত ছন্দে কবিতা রচনার উপক্রম করেছিলেন। যাতে তিনি হাত দেন নি সে হল অমিত্রাক্ষর ছন্দ।

প্রাক-কেশবসুত যুগে কিছু কিছু ছন্দোরূপ কোনো কোনো বিশেষ রসের দ্যোতক বলে মেনে নেওয়া হত। মনে করা হত এক একটা ছন্দ এক একটা বিশেষ ভাবের বাহন। কেশবসুত সেই সংস্কার ভাঙলেন এবং যেসব ছন্দকে বিশেষভাবে ধর্মীয় অথবা ভক্তিকাব্যের বাহন বলে স্বীকার করা হত, সেই সব ছন্দে বাস্তববাদী সামাজিক বিদ্রোহের কবিতা লিখলেন। সংস্কৃত কাব্যছন্দের বৃত্ত বা জাতি নিয়েও তিনি নানারকম পরীক্ষা করে-ছিলেন। তিন মাত্রার প্রচলিত ছন্দের বন্ধন অস্বীকার করে, তিনি স্বর-বর্ণের লঘুগুরু মূল্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তাঁর কাব্যে। কোনো কোনো গীতিকবিতায় তিনি একই কবিতার দুটি শ্লোকাংশের মধ্যে সংগতি রক্ষার জন্য তৎপর হন নি, বরঞ্চ ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে কখনো কখনো শেষ পংক্তিকে দীর্ঘায়িত করেছেন অথবা তাকে ধুয়ো হিসাবে ব্যবহার করেছেন। মিল নিয়েও তিনি নানারকম পরীক্ষা করেছেন। পর পর তিন পংক্তিতে মিল দিয়ে তিনি চতুর্থ পংক্তিকে টেনে নিয়ে ভিন্ন মিল বসিয়েছেন। এই ধরনের ছন্দোরূপ দেখা যায় তাঁর রচিত 'তুর্য' 'পেঁচা' 'ঝপুঝা' প্রভৃতি কবিতায়। কোনো কোনো আধুনিক ইংরেজী কবির মতো তিনি মিলের ব্যাপারে আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে, এমন সব মিল ঘটিয়েছেন যা দেখে প্রাচীন ছান্দসিকেরা আতংকিত হতে পারেন। 'শিঙ্গ'-এর সঙ্গে 'ফণ্ডক' কিম্বা

হাস্য'-এর সঙ্গে 'মানস', মিল হিসাবে উৎকৃষ্ট নয় কিন্তু এরকম মিল ঘটাতে গেলে বুকের পাটা থাকা চাই। মিলের ব্যাপারে তিনি ব্যঞ্জনাত্মক ধ্বনির চেয়ে স্বরাত্মক ধ্বনির উপর বেশী জোর দিতেন। প্রচলিত পয়ারের দুই পংক্তির অন্ত্য মিলের চাইতে তিনি পছন্দ করতেন ফারসি ঢঙের গজল গানের মিল যার প্রথম চরণের সঙ্গে তৃতীয়ের ও দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে চতুর্থের মিল দেখা যায়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় কেশবসুত কাব্যের রূপকল্প নিয়ে এত যে সচেতনভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন তা কেবল পশ্চিমী দৃষ্টান্তের অন্ধ অনুকরণে নয়, পরন্তু তিনি নিশ্চয় অনুভব করে থাকবেন যে প্রচলিত ছন্দশাস্ত্র ভাবকে কেবল অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধন করে, নির্বাধ প্রকাশের ক্ষেত্রে তাকে মুক্তি দেয় না। মারাঠী কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি নূতন রীতির প্রবর্তক। তাঁর মৃত্যুর পর বহু মারাঠী কবি তাঁরই অনুকরণে দীর্ঘ গাথা কবিতা ও গীতিকবিতা রচনা করেছেন। এমন কি গজলের অনুকরণে তিনি যে সমবিষম মিলের দুই পংক্তির কবিতা লিখতেন, পরবর্তী কালে তা ফ্যাশনে পরিণত হয় এবং রবি-কিরণ-মণ্ডলের কবিরা এই ধরনের কবিতা প্রচুর লেখেন।

মাধবরাও পটবর্ধন কেশবসুতের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "কবি হিসাবে তিনি কথার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।" এক হিসাবে বলা চলে পটবর্ধন কবির একপ্রকার প্রশংসাই করেছেন। কবিরা কথা নিয়ে এমন খেলা খেলেন, যা আর কারও পক্ষে সাধ্য নয়। কবিতার জাদু তো ওইখানেই। ওই জন্যই তো বলা হয় কবিতা অনুবাদ করা যায় না। কেশবসুতের এমন অনেকগুলি রচনা আছে যা মুখ্যত কথার উপর নির্ভরশীল। দেখা যায় এই সব প্রচলিত কথার মধ্যে যা কিছু বাসী, যা অতি-পরিচয়দুষ্ট তা যেন তিনি নিঙড়ে বের করে দিতে চেয়েছেন, যাতে তারা নূতন অর্থে উজ্জীবিত হতে পারে। এই দিক থেকে তিনি সত্যই অভিনব—মারাঠী কাব্যে তাঁর আগমন—কেবল আগমন নয়, আবির্ভাব।

কেশবসুত ছিলেন কাব্যাভিমানী, কাব্য নিয়ে সর্বক্ষণ তাঁর মধ্যে এমন একটি চাপা উত্তেজনার ভাব থাকত যে পরিহাসরসিকতা বলতে যা বোঝায়, তা তাঁর মধ্যে একপ্রকার ছিল না বললেই হয়। অবশ্য অন্য লোকের ঠাট্টা-মশকরায় তিনি যে যোগ দিতেন না এমন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর কৃত বোয়ালো-এর একটি কবিতার অনুবাদের কথা বলা যেতে পারে :

না যদি চাও দেখতে মূর্খে
মূর্খে-ভরা সংসারে,
একলা ঘরে আটক থাকো
ভাঙো আপন আয়নারে।

১৯৬৬ অব্দের এপ্রিল মাসে 'রাষ্ট্রবাণী'—পত্রে কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে অধ্যাপক শ্রী° কে° ক্ষীরসাগর লিখেছেন : "বাস্তবিকপক্ষে কেশবসুত মহারাষ্ট্রীয়দের আরাধ্য বিষয় সম্বন্ধে সমস্ত ধারণা বদলে দিয়েছেন। একটা সময় ছিল যখন সাধারণ মানুষ পন্ধরপুরের বিঠোবাকে নিয়ে প্রচুর মাতামাতি করত। কেউ কেউ মহারাষ্ট্রের লোকান্তরিত বীরপুরুষ অথবা অতীত গৌরবের স্মরণে চোখের জল ফেলত। প্রাচীন যুগের কবিরা রাম বা কৃষ্ণের অবতারণা করে তাঁদের ভগবদ্‌ভক্তির কথা গদগদভাবে ব্যক্ত করতেন—তা সে ভক্তি সত্য হোক কিংবা মিথ্যা হোক। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন যে কাব্যের বিষয় হতে পারে না, এ বিষয়ে তাঁদের সন্দেহ-মাত্র ছিল না। হ্যাঁ, কিছু কবি পাশ্চাত্য কবিদের অনুকরণে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা বিষয়ে লিখেছিলেম সত্য, কিন্তু সে-সব কবিতায় না ছিল রস না ছিল প্রাণ। তার মধ্যে যতটা না আন্তরিকতা থাকত তার চেয়ে অনেক বেশি থাকত কষ্ট কল্পনা। মহারাষ্ট্রীয় কবিদের মধ্যে সর্বপ্রথম কেশবসুতের কবিতায় ভাবের স্পষ্টতা, বিষয়ের বৈচিত্র্য ও আন্তরিকতার সত্য সুরের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।"

মা° ত্র্যং° পটবর্ধন প্রমুখ সমালোচকেরা কেশবসুতের কবিতায় একটা অসুস্থ, অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম মনোভাবের লক্ষণ দেখেছেন। তাঁরা বলেছেন কেশবসুতের কল্পনা ছিল যেমন উদ্ভট তেমনি অলংকারের প্রয়োগে তিনি ছিলেন কষ্টকল্পনার উপর নির্ভরশীল। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায় একটা অপরিণত ভাব লক্ষ্যগোচর হয় এ কথা সত্য, মনে হয় আসর জমাবার জন্য তিনি যেন অতিমাত্রায় চেষ্টিত। কিন্তু তাঁর সমগ্র রচনার পরিপ্রেক্ষিতে

যদি বিচার করা যায়, তাহলে এই অনুযোগ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হবে। অন্য যে-সব নিছক ব্যক্তিগত সমালোচনা করা হয়, যথা তাঁর পড়াশুনা বেশী ছিল না, তিনি চিরকাল মাস্টারী করে গেছেন—এ-সকলের কোনো অর্থ হয় না। তাটকে আক্ষেপ করে বলেছেন যে কেশবসুতের কবিতা পাঠকের চিত্তে আত্মবিস্মৃতি জাগায় না, তিনি ভাষায় অনেক বিলাতী ঢঙ আমদানী করেছিলেন, অপরিচিত কথা ব্যবহার করেছিলেন কিম্বা তিনি ছিলেন নৈরাশ্যবাদী—এসব নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এবং এর অধিকাংশই তাঁর সমগ্র কবিতাবলী সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। প্রফেসর রাং শ্রীং জোগ তাঁর 'কেশবসুত' নামক পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে এসব আলোচনার সবিস্তার উত্তর দিয়েছেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণ সহযোগে বলেছেন এর অধিকাংশই পক্ষপাতদুষ্ট ও অযৌক্তিক।

অসীমের প্রতি এবং ইন্দ্রিয়াতীত রহস্যের প্রতি, কেশবসুতের মধ্যে একটি যে-গভীর পিপাসা ছিল, তার উল্লেখ না করলে, এই আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যদিচ তিনি ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী ও তাঁর কবিতায় দেবদেবীর কোনো প্রত্যক্ষ উল্লেখ দেখা যায় না, তবু তাঁর মধ্যে একটি গভীর আধ্যাত্মিক আকুতি দেখা যায়। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এর মূলে ছিল ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনাসমাজের প্রভাব। মারাঠী কবিতায় এই প্রভাব ছিল খুবই নূতন। কেশবসুত যে নূতন মানবতাবাদের জয়গান গেয়েছিলেন তার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে মিশে ছিল বুদ্ধের করুণা ও সাম্য-আশ্রিত মানবকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থা। যে-কবিতা ছিল একদিন দেবদেবী কিংবা রাজা-রানী অবলম্বন করে, এখন তার আগ্রহের বিষয় হল অব্যবহিত বর্তমানে মানুষের সমস্যা। তৎসত্ত্বেও বলতে হবে কেশবসুতের কবিতার মধ্যে যে আদর্শনিষ্ঠা ছিল, তার তুলনা কেবলমাত্র মেলে শেলীর কয়েকটি ছত্রে :

সুদূর আকাশে তারা,
নেহারি তাহায় চোখে ঘুম নাই,
—জোনাকি নিমেষ হারা।
রজনী অন্ধকার,
আলোকের লাগি সে রয়েছে জাগি,
—বুকে নিয়ে হাহাকার।
দুঃখী মর্ত্যধাম
স্বর্গের তরে মাথা কুটে মরে,
—ক্রন্দন অবিরাম।

এই সীমাকে অতিক্রম করে অসীমের পথে যাত্রার আকুতি ছিল বলেই কেশবসুতের কাব্যের তাৎপর্য একদেশিক না হয়ে সার্বভৌম।

কেশবসুতের কাব্যে আর একটি যে-গুণ পাঠকদের চিত্ত আকর্ষণ করে, সে হল তাঁর শিশুসুলভ সরলতা। পৃথিবীতে নবাগত এই শিশু ভোলানাথের বিস্ময়ের অন্ত নেই, সবই যেন তাদের কাছে নূতন। যে-সব কবিতায় কেশবসুত শিশুদের এই সামান্য জিনিসে বিস্ময়ের ভাবটা প্রকাশ করেছেন, তা যেন সহজ প্রাণের আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। শিশুর চারদিকে যে সর্ববিধ্বংসী মারের রাজত্ব চলেছে, এবং (ওয়ার্ডস্বর্থের ভাষায়) তার চারদিকে যে কারাগারের প্রাচীর ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে—একথা তিনি যে না জানতেন তা নয়। কিন্তু হতাশার মধ্যে তিনি নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেন নি। কাব্যে সুন্দরের কি স্থান এ বিষয়ে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট ছিল, নিশ্চিত ছিল। ফলে তিনি প্রেমের কথা বলতে গিয়ে মৃত্যুর, এবং মৈত্রীর বা করুণার কথা প্রসঙ্গে হিংসা বা ক্রূরতার অবতারণা করে পরস্পরবিরোধিতা সপ্রমাণ করার জন্য, অতিমাত্রায় চেষ্টিত হতেন না। তিনি ভালোবাসতেন মাথার উপর সুনীল আকাশ ও নিচে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা ধরিত্রী—এ দুইয়ের বাইরে তিনি বড় একটা দৃষ্টিচালনা করতে চাইতেন না। নিজের দারিদ্র্য বা দুরবস্থা নিয়ে তাঁর বিশেষ কোনো আক্ষেপ ছিল না, তবে অন্য লোকের দারিদ্র্যদুঃখ তাঁকে গভীরভাবে পীড়া দিত।

সর্বশেষে পরলোকগতা কুসুমাবতী দেশপাণ্ডের লেখা থেকে আর একটি উদ্ধৃতি দেবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না :

"কাব্যসৃষ্টির সমস্যা বিষয়ে কেশবসুত গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তাঁর নিজের কাব্যভাবনার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে তিনি দস্তুরমতো ওয়াকিফ্‌হাল ছিলেন। কোনো কারণে কোনো শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি যদি হ্রাস পেত, কিংবা যদি অমার্জিত লোকেদের মুখে মুখে চলিত হবার জন্য সাহিত্যে তার অচল দশা ঘটত, তা হলে তাঁর দুঃখের অবধি থাকত না। মানুষের সমগ্র জীবনে কবিতার উচ্চ স্থান নিয়ে তিনি যেমন ভেবেছেন, তেমনি ভেবেছেন কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে কিভাবে প্রসন্ন রাখতে হয়। তাঁর সর্বমোট ১৩২টি কবিতার মধ্যে, কুড়িটি কবিতার বিষয় হল এই ধরনের কাব্যজিজ্ঞাসা। আধুনিক কালে মারাঠী কবিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সব প্রসঙ্গ নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ও ভাষায় সে সব ব্যক্ত করেছেন। কাব্যরচনা ও কাব্যের গঠন-বন্ধন বিষয়ে যাঁরা হাতেকলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন অগ্রণী। তিনি বিভিন্ন ছন্দের একত্র প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, পংক্তি

বিভাজনেও তিনি হ্রস্ব, দীর্ঘ, ও মাঝারি ধরনের পংক্তি ব্যবহারে নিপুণতা দেখিয়েছেন। প্রচলিত চার পংক্তির পয়ার পরিহার করে, তিনি মারাঠী কাব্যে প্রচুর বৈচিত্র্যের সূত্রপাত ঘটিয়েছেন।...কেশবসুতের সমগ্র রচনা একটি অনতিদীর্ঘ পুস্তিকার মধ্যে সমাহৃত। কিন্তু এই স্বল্পায়তন গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা প্রত্যালোচনা ও বাদ-প্রতিবাদের অন্ত নেই। এই সব আলোচনা-সম্বলিত একটি কেশবসুতের কাব্যবিষয়ক বৃহদায়তন গ্রন্থ অনায়াসে প্রকাশ করা চলে। রাজবাড়ে ও রহালকরের মতো সংবেদনশীল সমালোচকেরা যেমন তাঁর কবিতার উচ্চ প্রশংসা করেছেন, তেমনি বিরুদ্ধ সমালোচকেরা তার সীমিত শিক্ষাদীক্ষা ও রচনাশৈলীর দোষত্রুটি নিয়ে কটুকাটব্যও করেছেন বিস্তর। আবার কোনো কোনো সমালোচক বলেছেন যে তিনি ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক, বিষাদগ্রস্ত ছিল তার মন ও তাঁর স্বভাবে ছিল একটা কৃত্রিম উচ্ছ্বাসের আতিশয্য। কিন্তু দেখা যায় কেশবসুতের কাব্যের অন্তর্নিহিত গুণাবলী বার বার এই সব বিরুদ্ধ সমালোচনা অতিক্রম করে পাঠক সমাজে নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রেখেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার শক্তি, সত্যকার মৌলিকতা ও গভীর চিন্তাশীলতা সকলের স্বীকৃতি লাভ করেছে। সব চেয়ে বড় কথা এই যে আজ তাঁকে সকলেই একবাক্যে আধুনিক মারাঠী কবিতার জনক বলে মেনে নিয়েছেন। কেশবসুত থেকেই মারাঠী কবিরা কাব্যকে সত্যকার আত্মপ্রকাশের বাহন বলে ভাবতে শিখেছেন—তিনিই প্রথম ভগীরথের মতো ব্যক্তি অনুভূতির ধারা বইয়ে দিয়েছেন মারাঠী কাব্যের ক্ষেত্রে। কবি কি ভাবে জীবনকে দেখেছেন, সত্য কি ভাবে তাঁর চোখে প্রতিভাত হয়েছে, সামাজিক সমস্যা তিনি কি ভাবে অনুধাবন করেছেন, বস্তুজগতের অতিক্রান্ত রহস্যের জগতে তিনি কি ভাবে বিচরণ করেছেন—এই সব ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ সর্বপ্রথম দেখতে পাই কেশবসুতের কাব্যে। সেইজন্যই আধুনিক মারাঠী কাব্যের রূপ ও তার ভাব—এই উভয় দিক থেকেই বলা চলে কেশবসুত হলেন এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের অগ্রদূত।"

এবার কেশবসুতের কবিতার পরিচয় দেবার জন্য তাঁর কয়েকটি প্রখ্যাত কবিতার ভাবানুবাদ পরিশিষ্টে দেওয়া হল। বলা বাহুল্য কবিতা অনুবাদ কেবল কঠিন নয়, এক হিসাবে অসম্ভবও বটে। বিশেষতঃ নির্বাচিত কবিতাগুলির রচনাকাল হল আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে। আজকের ভাষা কেবল নয়, রস ও রুচিও নানাভাবে বদলে গেছে। তবু

আশা করা যায় যাঁরা মারাঠী ভাষা জানেন না তাঁরা এই সব অনুবাদ থেকে একটা কিছু ধারণা করতে পারবেন। পাঠকদের কাছে বিনীত অনুরোধ তাঁরা যেন এই অনুবাদগুলিকে কবিতা বলে না গ্রহণ করেন। বরঞ্চ তাঁরা যেন এইটুকুই লক্ষ্য রাখেন যে কবি যিনি তিনি উচ্চশিক্ষা কিংবা অন্যান্য সুযোগ পান নি। আজ থেকে সত্তর বছরেরও আগে নিতান্ত প্রতিভার জোরে তিনি যে কবিতা লিখে গেছেন, আজ সেজন্য তিনি আধুনিক মারাঠী কাব্যের জনক বলে স্বীকৃত হচ্ছেন। আমাদের এই স্বল্পায়তন সন্দর্ভের উদ্দেশ্যই হল সেই ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে কেশবসুতকে প্রতিষ্ঠিত করা।

নির্বাচিত কবিতা

নয়া সিপাহী

নবযুগে নবজনমের দ্বারে জাগ্রত হুঁশিয়ার
প্রহরী আমায় বাঁধিবে এমন সাধ্য রয়েছে কার।
হিন্দু নহিরে ব্রাহ্মণ নই নাহিক গোত্র জাতি
সারা দুনিয়ার ব্রাত্য পতিত সকলে আমার সাথী।
ক্ষুধার অন্ত নাই
সব কিছু খেতে চাই
কূপমণ্ডুক নহি তো আমার থাকবে যে শুচিবাই।

আমার খেতের চারিপাশে আমি ধারিনা বেড়ার ধার
আমারে বাঁধিবে দেখিব এমন বন্ধন আছে কার?
যেথা খুশি আমি সেথা চলে যাই সকলে আমার ভাই
আমার ঘর তো রয়েছে ছড়ায়ে সমস্ত দুনিয়ায়।
মাথার উপরে আছে নীলাকাশ
সবুজে সবুজে ভরে আছে ঘাস,
ছায়ায় ছায়ায় শিশুদের খেলা—
আলোকে হাসিছে কুসুমের মেলা,
সকলে আমার আমি সকলের—এই কথা জানি সার,
নূতন যুগের প্রহরী আমি যে জাগ্রত হুঁশিয়ার।

পূজা দেব কারে আমি
নিখিলেশ্বর স্বামী
মোর মাঝে তিনি নিত্য আছেন চির অন্তর্যামী।
নিজেই নিজের পূজা করি তাই আমাতেই আমি হারা,
আপনা হারায়ে যে খোঁজে নিজেরে, বুঝিনা তাদের ধারা।

ছোট কিবা বড়ো ভালো কি মন্দ—
নিকটে ও দূরে দারুণ দ্বন্দ্ব
সব বিপরীতে পেরেছি মেলাতে, মোর কাছে একাকার
আমারে বাঁধিবে দেখিব এমন বন্ধন আছে কার?

নির্গুণ তিল সগুণ চিনির পাকে
ময়রার হাতে নানারূপ লয়ে থাকে।
তেমনি বহুর মাঝারে যে-জন এক
বহু বিচিত্র হয়ে হল প্রত্যেক।
এক বহু হয়ে অনেক যখন হয়
একে অন্যেতে বিবাদ সুনিশ্চয়।
শান্তি রাজ্যে এক হয়ে যাবে দেশ জাতি পরিবার,
আমি সে যুগের অগ্রদূত যে জাগ্রত হুঁশিয়ার।

৮ মার্চ, ১৮৯৮

অচ্ছুৎ বালকের প্রথম প্রশ্ন

লাঠি হাতে যায় পুরুত ঠাকুর
যজমান বাড়ি আরো বহু দূর।
যেতে যেতে পথে দাঁড়ায় থমকি
নিদারুণ রাগে উঠিল ধমকি :
"এ কী অনাচার মেথরের ছেলে
পথের মাঝারে বেড়াবে কি খেলে?
জাতে ছোট হোক স্পর্ধা বেজায়
দেখোনা ধূলায় গড়াগড়ি যায়।
এই ছোঁড়াগুলো, হাঘরে হাভাতে,
চোপ দূর হও দাঁড়াও তফাতে।
বামুনের পথ আটকাবে নাকি
দাঁড়া একবার রাখি কি না রাখি!"
এই বলে তাড়া লাগায় বামুন
ছেলেরা পালায় করে মুখ চূণ।
একটি কেবল বোকা-মত ছেলে
দাঁড়াল সমুখে দুই চোখ মেলে,
শুধায় ঠাকুরে "কেন এত রাগ?"
পিছু হটে কয় "যারে বেটা ভাগ.
জানিসনে তুই মাড়ালেও ছায়া

জাত যাবে মোর; ওরে ও বেহায়া,
লাঠি ছুঁড়ে মাথা ভাঙব কি তোর?
পথ ছেড়ে দে না যেতে হবে মোর।"

মাথা হেঁট করে মেথরের ছেলে
শুধায় মায়েরে বাড়ি ফিরে গেলে :
"ছায়া মাড়ালেও জাত বুঝি যায়
কি দোষ করেছি, বল দেখি আই?"
হাসিয়া কাঁদিয়া মা বেচারা বলে,
"হা হতোহস্মি, হ্যাঁরে বোকা ছেলে
জানিস না কিরে উঁচু জাত ওরা
সবার অধম মেথর যে মোরা।
ছায়া মাড়ালেও পাপ যে ওঁদের
তাই তো হটিয়ে দিয়েছে তোদের।"

নতমুখে ছেলে মনে মনে কয়
"ছোটরে দাবিয়ে বড়ো তবে হয়।
নীচুদের ঘাড়ে চাপে যেইজন,
সমাজের তারা মাথার ভূষণ।"

৩ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮

মূর্তিভঙ্গ

চুরমার ভেঙে ফেলি পাথরের মূর্তি
রত্ন ও ধাতু লুটে হবে পেট পূর্তি।
উপাচারে গলবে কি পাথরের মনটা
বৃথা নাকে খত আর শঙ্খ ও ঘণ্টা।
জংলী দামাল মোরা শক্ত ও তাগড়া
লুটেপুটে নেব সব মানবো না বাগড়া।
ডাইনীর হেঁয়ালির ফাঁদে পাটা দিলে পর
চলে যাব সোজা তার উদরের গহ্বর।

সাবধানে এড়িয়ে সে কুহকীর মায়া তাই
লুটপাট ভাঙাচোরা করি এই কাজটাই।
ধনীদের দেবতায় ভেঙে জোড়া লাগাবো
বেসাতি না করে নব বোধনেতে জাগাবো।
গরীব হোক না মোর গরীবের দেবতা
লুটকরা ধন যত লুটেপুটে নেব তা।

সর্বশেষ কবিতা

জনৈক মজদুরের অনশনে মৃত্যু

দিবসান্তে সূর্যদেব গেল অস্তাচলে
রঙে রঙে রাঙা হল পশ্চিম আকাশ,
হাস্যমুখে লোকজন চলে দলে দলে
আমি একা পথে বসে করি হা হুতাশ।
বৃথা কাজ খুঁজে খুঁজে গেল দিনমান
হাতে না মিলিল মোর কানা এক কড়ি,
মজদুরি করে দিন হয় গুজরান
আজ না জুটিল কাজ কি যে আমি করি।

সারি সারি ইমারত কত যে দালান
বাপদাদা গড়েছিল আপনার হাতে
অভাগা তাদের ছেলে মাটিতে শয়ান
খানাপিনা করে বাবু ইয়ারের সাথে।

ওদের সুখের অন্নে চাহিনিকো ভাগ
একখানা মোটা রুটি পেলে হত ঢের,
খেটে খেটে প্রাণ মোর যায় যদি যাক
না খেয়ে মরণ দশা হতভাগ্যের।

সবারে সমান দেখে শুনি ভগবান
তবে কেন বীতরাগ গরীবের 'পরে,

মোটারা মিঠাই যত পেট পুরে খান
শুধু রুটি কেন নাই অভাগা[illegible]

মুখে লয়ে কুটোকাটা পাখি যায় নীড়ে
শাবকের লাগি তার মায়া দেখি কত,
হায়রে আমার ঘরে নাহি চাল চিঁড়ে
অনাহারে ছেলেমেয়ে ক্রন্দনরত।

তাদেরে প্রবোধ দিয়ে মাতা ধীরে বলে
'কেঁদোনা বাছারা সব, বাবা গেছে কাজে,
খাবার আনবে কত কাজ সারা হলে
মিছেমিছি কাঁদাকাটা মোদের না সাজে।'

হায় তারে কি যে বলি, কি বলে বোঝাই
অভাগার সংসারে অনশন সার,
তিলে তিলে মরা যদি বেঁচে থাকাটাই
আঁতুড়ে মরণ হলে ক্ষতি হত কার?

জানুয়ারি, ১৮৮৯

স্ফূর্তি

পূর্ণ পেয়ালা ভরে দাও ফের ফেনিলোচ্ছল সুরাতে
নানারঙে রাঙা রঙীন নেশারে কভু দিয়োনাকো ফুরাতে।
আলাপে লাগুক প্রলাপের সুর কণ্ঠ জড়াক নেশাতে,
পরোয়া করি না, পাকা হতে চাই মাতাল হবার পেশাতে।
আলগা করিতে জিভেরে মদের জেনো আর জুড়ি নাই
উত্তাপে তার মাটি ও আকাশ একাকার গলে যায়।
নেশার নেশাতে মশগুল হয়ে ধ্যান করো যারে পেলে না
কণ্ঠে যদিও সুর নেই তবু গাও গলা ছেড়ে তেলেনা।
রেগে টগবগ করুক না লোকে ঝগড়া চাক না কুড়াতে
পূর্ণ পেয়ালা ভরে দাও ফের ফেনিলোচ্ছল সুরাতে।

শুনেছি ত্রেতায় বেদজ্ঞ ঋষি পাতনসিদ্ধ সোম
পান করে বুঁদ হবন করিত যাগ ও যজ্ঞ হোম।
সেই সোমরস কিঞ্চিৎ যদি পাই মোরা তৃষাতুর
আচার বিচার জঞ্জাল যত ঝাঁট দিয়ে করি দূর।
স্বপ্ন ভেলায় ভেসে তবে যাই সুনীল আকাশ সাগরে
তারাফুল কিছু ছুঁড়ে দিই যেথা আছে দুনিয়ার হাঘরে।
দেবে ও দানবে বাধা দিতে এলে মানবো না হার কিছুতে
মনগড়া যত দেবতা দানবে আনবোই টেনে নিচুতে।
চলো তবে যাই স্বপ্ন ভেলায় তারাফুল কিছু কুড়াতে
পূর্ণ পেয়ালা ভরে দাও ফের ফেনিলোচ্ছল সুরাতে।

ভাগ্য দিয়াছে আমাদের হাতে লেখনীর হাতিয়ার
তামাম দুনিয়া উলটি পালটি করে দেব ছারখার।
ইনকিলাবের ঝাণ্ডা তুলিব অত্যাচারীর গ্রাস
অন্যায় আর জুলুমবাজির ঘটিবে সর্বনাশ।
লক্ষ কণ্ঠে জিগির তুলিব 'হর হর মহাদেও',
জাগিয়া আবার উঠিবে সবাই ঘুমায়ে রবে না কেউ।
'জাগো জনগণ ঘুমালে মরণ' এই কথা হেঁকে বলি,
'সমুখ সমরে সত্যের তরে প্রাণ দিতে হবে বলি।'
ছন্দ মোদের রণদুন্দুভি দিবেনাকো কান জুড়াতে
পূর্ণ পেয়ালা ভরে দাও ফের ফেনিলোচ্ছল সুরাতে।

২৩ মে, ১৮৯৬

চললি কোথায়?

'চললি কোথা, বল দিকিনি'?
'চলছি আমি কিনতে চিনি।
অমুক লোকের পুত্র হল
চিনি কিনতে তাই বলল।'

'চললি কোথা, দুলিয়ে দুল'?
'চলছি আমি তুলতে ফুল

অমুক লোকের মেয়ের বিয়ে
গাঁথব মালা ফুল সাজিয়ে।'

'হনহনিয়ে কে রে চলে?'
'দেখছো হাতে বাজার থলে,
নতুন পাতা সংসার
অনেক জিনিস দরকার।'

'ও মশাই তাড়া কিসের?'
'শ্বাস উঠেছে আমার পিসের।'
'কোবরেজকে খবর দাও,
সারো ঘাটের ব্যাপারটাও।'

শবযাত্রায় চললো বুড়ো
'কোথায় যাও অমুক খুড়ো?'
গুমরে ওঠে বাতাসখানা,
কোথায় যাবে নেই ঠিকানা।

১২ জুন, ১৮৮৯

কুরূপ

(বিদ্যালয়ে আমার এক গুরু আমায় বলেছিলেন কুরূপ—ফলে—)

গুরু, তুমি ঠিক বলেছো
সুরূপ আমি নইরে,
সবাই বিরূপ এ রূপ দেখে
সাচ্চা কথা কইরে।
সবার কাছে স্পষ্ট যাহা
সেই কথাটা বলে,
কি লাভ জানি হল তোমার
কেনই খুশি হলে।

কুরূপ কবি বিধির বরে
করবে নূতন রচনা
পড়বে দেখো জগত জনে
হরষ হয়ে কত না।
এ মুখ থেকেই ঝরবে জেনো
অমৃতেরি নির্ঝরণ
পান করে সে মধুর সুধা
তৃপ্ত হ'বে বিশ্বজন।

মাথায় তোমার এই কথাটা
খেলত যদি একটুও
রূপের বালাই নিয়ে তুমি
পারতে দিতে ধিক্ দুয়ো?
পিপীলিকার সমান বলে
তুচ্ছ তুমি করছ যারে,
হয়তো কখন পাখির মতন
নীল আকাশে উড়তে পারে।
আগুন তাহার থাকতে পারে
বলছ যারে ভস্মরাশ
সেই আগুনে জ্বলতে পারে
বিশ্বজোড়া সর্বনাশ।
এ মুখ থেকেই ঝরবে জেনো
অমৃতেরি নির্ঝরণ,
পান করে সে মধুর সুধা
তৃপ্ত হ'বে বিশ্বজন।
কুরূপ দেখে বিরূপ তুমি
দেখবে তোমার বংশধর,
কবির কেমন আনন ছিল
কইবে নাকো অতঃপর।

১৮৮৬

প্রকৃতি ও কবি

ছায়াতরু গান করে মৃদু মর্মরে
কবিদের সাধ্য নাই সেই তান ধরে।
কুলায়ে কূজন করে পাখি সুমধুর
হেন কোন্ কবি আছে ধরে সেই সুর।

শ্রাবণের ধারা কাঁদে ঘন বরিষণে
যোগ দেবে কোন কবি সেই ক্রন্দনে।
কুঞ্জকুটীরে বহে মলয় বাতাস
কার সাধ্য এত মৃদু ফেলে নিঃশ্বাস।

কাব্যকণিকা

বিশ্বটা কত বড়ো ওসারে
যত বড়ো মানুষের মাথারে।

*

হৃদয়ে তোমার বিশ্বজগৎ
হৃদয়ে সপ্তসিন্ধু
বক্ষের মাঝে এই সৃষ্টির
রয়েছে কেন্দ্রবিন্দু!

*

মিথ্যাই করি বৃথা অনুতাপ
আমি তো নইরে নিজে মোর বাপ,
মিথ্যাই ফেলি অশ্রুর ধার
মরণং ধ্রুব এই জানি সার।

*

দুঃখের শীধু চক্ষু মুদিয়া
পান করো নিঃশেষ,

খাঁটি শেষ হলে উপুড় পাত্রে
গাদটুকু অবশেষ।
বিষ পান করে যেটুকু তলানি
ফেলো ধরণীর বুকে
শুভখনে তাই হবে সুধাময়
কোনো অভাজন মুখে।

দ্বিতীয় পুরুষ কর্তা হবে
সকল ক্রিয়া কর্মে
ব্যাকরণের পাদটীকার
বিধান এই মর্মে।
বুক ফুলিয়ে বলছ বটে
'কারো আমি ধারিনে ধার',
কাজের বেলা বেবাক ঠুঁটো
ফার্স্ট পার্সন সিংগুলার।

১৮৯৮

আদিতে ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিল না

ক্ষুধাতৃষ্ণা ছিলনাকো সৃষ্টি সূচনায়
অন্ন আর ওষ্ঠ দোঁহে ছিল এক ঠাঁই।
লিঙ্গ আর যোনি মাঝে না ছিল অন্তর
একই দেহে নরনারী অর্দ্ধনারীশ্বর।
হস্তপদ অবয়ব ছিলনাকো কিছু
ছিলনাকো কাজকর্ম ছোটা আগুপিছু।
স্বর্গ আর মর্ত্যে কোনো নাহি ছিল ভেদ
দুঃখ কষ্ট ছিলনাকো আর চিন্তা খেদ।

১৮৯৮

আমরা কারা ?

বিশ্বপিতার দস্যি দামাল দুলাল ছেলে ভাই
মোদের খেলার মাঠ ছড়িয়ে তামাম দুনিয়ায়।
যখন খুশি যেথায় খুশি তেমনি যাই চলে
স্থান ও কালের বেড়া যত ডিঙাই অবহেলে।
ধনৈশ্বর্য পায়ে ঠেলি, চোখ ধাঁধানো সার,
হাতে বানাই কারুশিল্প কেমন চমৎকার।
আমার হাতের জাদুর গুণ করব কত গান
তোমার হাতের ভূষি লয়ে বানাই সোনার ধান।
বনজংগল কেটে মোরা বসত বানাই খাশা
স্বর্গে মর্ত্যে ভেদ রবেনা এই আমাদের আশা।
হাতে আমাদের অমৃত ভান্ড মৃত্যুমারণ মন্ত্র
যন্ত্রী মোদের বিশ্বকর্মা, আমাদের হাতে যন্ত্র।
আমরা নহিলে বিশ্বসুদ্ধ হবে যে অন্ধকার
কপর্দকের মূল্যে বিকাবে মানুষের সংসার।

ফৈজপুর, ২৯ নভেম্বর, ১৯০৯

তূর্য

তূর্য হাতে যদি দাও মোর—
প্রাণবায়ু পূরে তাতে বাজাই সঘনে
ধ্বনি তার রণরণি উঠিবে গগনে,
সুতীব্র নিখাদে তার শিহরিবে রাতি
কেটে যাবে স্বপ্ন ঘুমঘোর।

সেই তূর্য যদি দাও হাতে—
যে ধ্বনি নীরব আছে মরু প্রান্তরে
প্রতিধ্বনি তুলি তার গভীর অন্তরে,

অকস্মাৎ ফুৎকারে ডেকে আনি যত
নিদ্রাতুর ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে।

জানি বটে বীণা সুমধুর—
সারেঙ্গী সানাই আর মৃদঙ্গ ঝঙ্কার
বেণুতে সেতারে কত সুরের বাহার,
কি কাজ মধুরে মোর যদি দিতে পারি
বিষাণেতে ভীষণের সুর।

আজো যারা রত ভূরিভোজে—
সংস্কার অনাচার রাক্ষসের প্রায়
দন্তে নখে ছিঁড়ে যারে গ্রসি নিতে চায়,
তূর্যনাদে কি যে বাজে সাবধানবাণী
হায় মূঢ় কিছু নাহি বোঝে।

আকাশ ঢেকেছে ঘন মেঘে—
ছিন্নভিন্ন সূর্যালোকে ভেঙে খান খান
আমের মঞ্জরী যত ভূমিতে শয়ান,
পঙ্গপালে ছেয়ে গেল ফসলের ক্ষেত
তবু কেহ কোথা নাহি জাগে।

আজো আস্থা ইন্দ্রজালে যার—
পুরাতনে প্রীতি লয়ে আত্মপ্রবঞ্চিত
অধুনাতনেরে নিন্দা করিছে সতত,
ভূরিভোজে তৃপ্ত এই ঔদরিক দলে
তূর্য হানে সুতীব্র ধিক্কার।

আজো দেখি পুরাতন নভে,
নবীন তারকা ভাসে জ্যোতিষী গোচরে
শ্যাম শষ্প জন্ম নেয় জীর্ণ ধরা 'পরে,
সাগর আজিও দেয় নব রত্নরাজি
নবীনেরে কেন মন্দ কবে ?

পুরাতন যায় যদি যাক,
ধূলায় মিশাক যত আবর্জনা ধূলি
চিতায় কবরে দাও শবদেহ তুলি,
আপনার মনে শোনো প্রাণের গভীরে
বিষাণের ভবিষ্যের ডাক।

ইলোরায় এসো এদিনের
হেথায় জীবনে তোলো শিল্পায়ত করি
হাতুড়ি ছেনিরে শক্ত বাহুবলে ধরি।
বসে বসে খেয়ে আর দিন গুনে গুনে
দেখো মেদ জমিয়েছো ঢের।

চুপচাপ বসে থাকা মিছে,
যা বলার ছিল বলেছেন প্রাচীনেরা
হোক না সে জ্ঞান সকল জ্ঞানের সেরা,
সেলাম বাজিয়ে জোয়ানেরা আগুয়ান
কেন বসে থাকবে যে পিছে।

প্রকৃতি করে না মায়া কারে—
পিছু ফিরে কারো তরে চাহেনাকো পথ
দ্রুত টেনে লয়ে চলে সময়ের রথ,
চক্রের ঘূর্ণনে তার নিষ্পেষিত সব
চূর্ণ করে কঠিন পাহাড়ে।

মুখোমুখি দাঁড়াও তাহার—
ভাঙা ঘরে মন্ত্রপাঠ, শিশুর রোদন,
অসহায় পৌরুষের অশ্রু বিসর্জন
অতিক্রমি সব কিছু নিজ বাহুবলে
গড়ি তোলো যশের মিনার।

তোমাদের একতার বাঁধ
ভেঙেচুরে খান খান বিরোধে বিদ্বেষে
ফাটল দিয়েছে দেখা হতভাগ্য দেশে,

আপনার স্বার্থে তবে করো বলিদান
দেশপ্রেমে যদি রয় সাধ।

দেশ জুড়ে কাঁদে কারা শোনো—
বিধবা অনাথ যত শোকে উতরোল
দিকে দিকে উঠে কত ক্রন্দনের রোল
স্বামীহারা পিতৃহারা কাঁদে যেই পাপে
প্রায়শ্চিত্ত করেছ কি কোনো ?

রক্ত চাই, রক্ত দিতে হ'বে—
মানুষের মেষ হওয়া সাজে না এখন
স্বদেশের তরে করো আত্মবিসর্জন
দিকভ্রম কোরোনাকো ঘোর অন্ধকারে
বীর যদি, ধীর হও তবে।

ধর্মের নামে ভণ্ডামি যত—
ধর্ম কেবল রয়েছে মুখের বোলে,
সুনীতির পথে আচারের বাধা তোলে,
জানেনা যাহারা নীতিপথে অবিচল
স্থির ধর্মেতে তাহারাই তত।

যুদ্ধ লড়িতে ভণ্ডের সাথে
নূতন নীতির নওজোয়ানেরে ডাকি
সঘনে বিষাণ বাজায়ে তাদের হাঁকি,
সাম্যের ধ্বজা উড্ডীন হোক আকাশে,
বাজুক দামামা শক্ত হাতে।

আইনের চেয়ে মানুষ যে বড়ো—
মানুষের লাগি আইন বিধান সব
আইনের কাছে মেনোনাকো পরাভব,
প্রগতির পথে হটাও আইন মিথ্যা
আজাদী ঝাণ্ডা উচুচে ধরো।

নেমে পড়ো এ মহা-আহবে—
প্রগতির ধ্বজা লুটাবে কি ধূলিতলে
ঘোচাও বন্ধ আপনার বাহুবলে,
বীর হুংকারে শত্রুরে দাও রণ,
হর হর মহাদেও রবে।

পুরাণে দেবতা দানবের রণ,
আজো তারি জের চলেছে নানান রূপে
দানবেরা ঘেরে চারিদিকে চুপে চুপে,
দেবতার হাতে হাত রেখে এসো বলি
আমাদের পণ দানব নিধন।

২৮ মার্চ, ১৮৯৩

ঝমাঝমঝমঝমারে*

[আমরা যা কিছু জানিনা বুঝিনা তার মধ্য থেকে মহাত্মারা জগতের কল্যাণকর সামগ্রী আবিষ্কার করে থাকেন। মহাত্মাদের এই চিত্তের ক্ষমতা স্মরণ রেখে যদি নিচের কবিতা পড়া হয়, তাহলে হয়তো খুব বেশি দুর্বোধ্য হবে না]

হর্ষ নাই খেদ নাই
হাস্য নাই অশ্রু নাই।
কাঁটা ছিল কোমল হল
কিছুই নাহি দেখা গেল।
আলো ছিল আলোক নাই
আঁধার ছিল আঁধার নাই।

* মূল মারাঠী কবিতার নাম 'ঝপুঝাঁ'। এই মারাঠী কথার বাংলা শাব্দিক অর্থ করা যেতে পারে ঝমঝমাঝম। শ্রাবণ মাসে কুমারী মেয়েরা যখন চুল ও আঁচল উড়িয়ে কাজরী গান গেয়ে নাচে, তখন তারা 'জা পোরী জা' অর্থাৎ 'যা ছুঁড়ি যা' বলে হর্ষ প্রকাশ করে থাকে। তাড়াতাড়িতে বলতে গিয়ে কথাটা শোনায় ঝপুর্ঝা। এই গদ্য টিপ্পনী কবির কাছ থেকে নেওয়া।

কি বলে এই দশাটারে
ঝমাঝমঝমঝমারে।

সকলের হর্ষ শোক
দেখতে পায় যেই লোক,
তারা কিছু বোঝে কি?
কিছু তারা জানে কি?
যদি হাসে বিজ্ঞজন
বলি মোরা 'শোন শোন,
অর্থহীনের থাকে মানে
পাগল মজে তার প্রমাণে।'
কী বলে সেই অর্থটারে
ঝমাঝমঝমঝমারে।

জ্ঞানের বেড়া টপকায়
চিৎ-চপলা চমকায়।
আপন মনে আকাশে
উড়ে চলে বাতাসে।
নাচে ঘুঙুর নাচে মল
আঁধার করে ঝলমল।
কি গান গায় কি তার মানে
ত্রিসংসারে কেউ না জানে।
যেমন গান তেমন তান
যেমন তাল তেমন মান।
বাজছে সুরে ঝংকারে
ঝমাঝমঝমঝমারে।

আছে জমি নেইকো চাষ
সেইতো জমি আসল খাস।
কে সেই জমির জমিনদার
দলিল আছে হাতে কার?
এক মালিক এক হাজারে
বনের প্রভু বনরাজারে।

গাঁথব মালা বনফুলে
আনগে দেখি সে-ফুল তুলে।
তুলতে ফুল নেই মানারে,
ঝমাঝমঝমঝমারে।

সেই তো পুরুষ যার প্রকৃতি
প্রণয় করে নিতি নিতি।
লীলাখেলার ভাষা তার
সকল জ্ঞানের সারাৎসার।
সত্য সে-ধন করতে লাভ
সবার সঙ্গে করো ভাব।
ধ্রুপদ গাও কি ধামারে
ঝমাঝমঝমঝমারে।

সূর্য চন্দ্র নিযুত তারা
সবাই প্রেমে আত্মহারা।
সবাই প্রেমের দোলায় দুলে
আকাশ ছড়ায় ফুলে ফুলে।
সেই ফুল তুলিতে
আপনারে হয় ভুলিতে
একলা অভিসারে
যাবি আকাশ পারে।
দুলবি দোলায় গাইবি গান
হর্ষে সুখে উথল প্রাণ।
পায়ে বাজবে রারম্বারে
ঝমাঝমঝমঝমারে।

২ জুলাই ১৮৯৩

বন্ধুর ঘর

এইখানে ছিল বন্ধুর বাসাখানা
একদিন হেথা কত ছিল আনাগোনা।
বন্ধু মোদের সব বন্ধন ছেড়ে
স্বদেশের তরে দিয়েছিল আপনারে।

বন্ধন ছাড়া জগতে মুক্তি নাই
বন্ধনে বাঁধা গোটা সংসারটাই।
তারকায় দেখো, মণ্ডল ছেড়ে গেলে
পুড়ে খাক হয় শূন্য আকাশতলে।

সূর্যের প্রতিফলিত আলোয় শশী
ধরণীর হাতে বন্ধ অহর্নিশি।
সে-বাঁধন ছেড়ে সূর্যের সেবা করা
সর্বনাশের আগুনে পুড়িয়া মরা।

ঘরনীরে ছেড়ে বন্ধু ছাড়িল ঘর
স্বদেশ সেবায় এমনি সে তৎপর।
ঘর ছেড়ে গেছে অন্য শহরে চলে
দরজায় তার মস্ত কুলুপ ঝোলে।

কতদিন গেছে স্বদেশের কথা তুলে
আহার নিদ্রা সকলি গিয়েছি ভুলে,
হাহুতাশ কত করেছি যে নিষ্ফল
সকলে মিলিয়া ফেলেছি চোখের জল।

কত রাত ভোর হয়েছে পাখির ডাকে
সে-সব খবর এখন কে আর রাখে,
শীতল বাতাসে উঠেছে কুসুম ফুটে
রাতের আঁধার প্রভাতে গিয়েছে টুটে।

তখন বলেছি কবে ভোর হবে রাতি
নূতন দিনের জ্বলিবে উজল বাতি,
রবির কিরণে ঝলসিবে মহাকাশ
ঝটিতি টুটিবে পরাধীনতার পাশ।

সে আলো সে-দিন নাই যদি দেখি চোখে
ধিক্ এ জনম এই দাসত্বলোকে,
স্বদেশের তরে করিব কি প্রাণপাত
উষার দুয়ারে হানিব কি করাঘাত?

কত প্রশ্নই করেছি পরস্পরে
হর্ষ বিষাদে সুখী দুখী অন্তরে
প্রবোধ দিয়েছি সকলেই সকলেরে
'ইচ্ছা থাকিলে উপায় ঠেকাবে কেরে।'

এখন বন্ধু কোথায় গিয়েছো চলে
কোন কাজে গেছো, কিছুই গেলে না বলে,
হয়তো প্রেরণা দিতেছো অপর জনে
স্বদেশের তরে আপনা বিসর্জনে।

দুয়ার তোমার বন্ধ দেখিয়া খেদে
বিরহে আমার পরাণ উঠিছে কেঁদে,
তোমা সনে দেখা হবে কি আবার মোর
এই কথা ভেবে নয়নে বহিছে লোর।

মুদিত কমলে দেখিয়া ভ্রমর বলে,
'মিত্র আসিয়া খুলে দেবে শতদলে।'
তেমতি আমিও গুঞ্জনরত অলি
ব্যথিত হৃদয়ে ঘর পানে ফিরে চলি।

মে, ১৮৮৭

গ্রন্থপঞ্জী

কেশবসুতের কাব্যগ্রন্থ

१. केशवसुत यांची कविता : संग्राहक, हरी नारायण आपटे, १९१७

२. कृष्णाजी केशव दामले यांचा कविता-संग्रह व चरित्र : संपादक सीताराम केशव दामले

३. केशवसुतांची कविता (आवृत्ति चौथी) : संपादक : परशराम चिंतामन दामले, १९३८

४. केशवसुतांची कविता (आवृत्ति पांचवीं) : संपादक : परशराम चिंतामण दामले, १९४९

५. हरपले श्रेय : संपादक : रा. श्री. जोग, १९५६

রচনা ও বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ

६. केशवसुत आणि त्यांची कविता : न. शं. रहाळकर, १९१९

७. तुतारीची पडसाद : श्री. वि. वर्तक, १९१६

८. केशवसुत (काव्य-दर्शन) रा. श्री. जोग, १९४८

९. केशवसुत : चरित्र, चर्चा अभ्यास : संत-गाडगिल

१०. केशवसुत चरित्र विषयक टिपणे : शं. का. गर्गे—'रत्नाक', फरवरी १९२६

११. केशवसुत चरित्र विषयक टिपणे : शं. का. गर्गे—'रत्नाकर' नवम्बर-दिसम्बर १९३०

१२. केशवसुत चरित्र विषयक टिपणे : शं. का. गर्गे—'रत्नाकर' फरवरी १९३१

१३. केशवसुत—मृत्युलेख—'काव्य रत्नावली', दिसम्बर १९०५

१४. केशवसुत—चरित्रलेखन—'काव्य रत्नावली', अंक पहला १९१७

१५. केशवसुत—चरित्र—लेखन-सी. के. दामले 'केशवसुतांची कविता' संस्करण २, ३, ४

१६. केशवसुत—चरित्रलेख—श्री. ह. अत्तरदे—'यशवंत', जनवरी १९४५

१७. केशवसुत आणि विनायक—श्री. गु. चिक्केरूर 'यशवंत' अप्रैल १९४५

१८. मराठी काव्याची उत्क्रांति व केशवसुत : बा. अ. भिडे, काव्य चर्चा, पृ० २०४ से २१९

१९. केशवसुत आणि क्वीचा व्यापार—प्रा. र. प. सबनीस —'काव्यचर्चा', पृ० २२० से २२७

२०. केशवसुत—श्री साधुदास 'काव्य चर्चा' पृ० २२८ से २३१

১মহারাষ্ট্র সরকারের সৌজন্যে প্রাপ্ত ও গোপাল রামচন্দ্র পরাঞ্জপে সংকলিত

२१. केशवसुत व टिळक : प्रा. वा. गो. मायदेव—'काव्यचर्चा' पृ० २३२ से २४६
२२. केशवसुत—ग. त्र्यं. माडखोलकर—'आधुनिक कविपंचक' पृ. ५३-८४
२३. केशवसुत—ग. त्र्यं माडखोलकर—'काव्य विचार' पृ. १ से १४
२४. केशवसुत—गेल्या साठ वर्षांतील मराठी कविता—ग. त्र्यं माडखोलकर 'अर्वाचीन मराठी साहित्य'
२५. केशवसुत—रा. श्री. सरवटे—'मराठी साहित्य समालोचन' पृ. ४० से ५७
२६. केशवसुत—वि. सी. सरवटे—'मराठी साहित्य समालोचन' पृ. २१३ से २२३
२७. केशवसुत—दा. न. शिखरे—'मराठीचा परिमल' खंड २ पृ. ५२५ से ५६१
२८. केशवसुत—वि. पां. दांडेकर—'मराठी साहित्याची रूपरेषा', उत्तरार्ध पृ. ५५ से ६५
२९. केशवसुत—अ. ना. देशपांडे 'आधुनिक मराठी वाङ्मयाचा अितिहास' भाग पहला
३०. केशवसुत—भ. श्री. पंडित—'आधुनिक मराठी कविता' पृ. १४०
३१. केशवसुत—माधवराव पटवर्धन—'अर्वाचीन मराठी वाङ्मयसेवक' प्रथम खण्ड पृ. ९८ से १७५
३२. केशवसुतांच्या काव्यदृष्टीतील अुत्क्रांती
३३. नवा शिपायी (रसग्रहण)
३४. आम्ही कोण (रसग्रहण)
} कुसुमावती देशपांडे 'पासंग' (टीकात्मक लेखसंग्रह)
३५. केशवसुतांची कविता—प्रि. वै. का. राजवाडे 'मनोरंजन' जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर १९२०
३६. केशवसुत—प्रा. मं. वि. राजाध्यक्ष ('पाच कवि'—सं. राजाध्यक्ष),
३७. केशवसुत—डा. पा. दा. गुणे—मनोरंजन, अक्टूबर १९१७
३८. 'झपूर्झा आणि म्हातारी'—श्री. म. वर्दे—'मनोरंजन' जनवरी १९२०
३९. केशवसुताची राष्ट्रीय कविता—ना. म. भिडे, 'मनोरंजन' नवम्बर १९२५
४०. केशवसुतांचे अंतरंग—वि. कृ. आंबेकर—मनोरंजन मार्च १९१८
४१. केशवसुत यांची कविता—ना. म. भिडे—'विविधज्ञान विस्तार', अंक ६ जून १९१९
४२. केशवसुतांची अभिनव काव्य-रचना—रा. कृ. लागू—नवयुग, अक्टूबर, नवम्बर १९२१
४३. केशवसुतांचा सांप्रदाय—ग. त्र्यं. माडखोलकर—नवयुग, जुलाई १९१९
४४. केशवसुतांचा सांप्रदाये—अे. या. निफाडकर—'नवयुग', अगस्त—सितम्बर १९१९

४५. तुतारी वाङ्‌मय व दसरा—वि. स. खांडेकर—'नवयुग' अगस्त—सितम्बर १९२९
४६. केशवसुतांचा परंपरेविषयीं कांहीं त्रोटक विचार—प्रा. श्री. बा. रानडे—'महाराष्ट्र साहित्य' अगस्त न अक्टूबर १९२३
४७. केशवसुत (काव्य) —रा. श्री. जोग—प्रदक्षिणा १९४९
४८. केशवसुतांची कविता—प्रि. वा. ब. पटवर्धन—'रत्नाकर' जनवरी १९२६
४९. केशवसुतांची कविता—वा. कृ. ताटके—'मनोरंजन', दिसम्बर
५०. केशवसुताच्या कवितेचा अभ्यास—अ. म. जोशी—'सह्याद्रि' सितम्बर १९४०
५१. कवि केशवसुत (अेक बाजू) —ह्. श्री. शेणोलीकर—फ. कालेज मैग. सितम्बर १९४०
५२. नव्या युगाचा काव्यप्रणेता—अ. ह्. जोशी—फ. कालेज मैग.
५३. अभिप्राय (केशवसुतांची कविता) —श्री. न. चिं. केलकर 'केशवसुतांची कविता' संस्करण चौथा
५४. केशवसुत—ना. के. बेहरे—'केशवसुतांची कविता' संस्करण चौथा
५५. काव्य आणि क्रांति—आ. रा. देशपांडे—'अभिरुचि' सितम्बर, अक्टूबर १९४४
५६. केशवसुतांची कविता—आचार्य भागवत—'सत्यकथा' फरवरी १९४८
५७. केशवसुत—लालजी पेंडसे—'सत्यकथा' फरवरी १९४८
५८. केशवसुत—प. चिं. दामले—'युगवाणी' नवम्बर १९४७
५९. तुतारीचे पडसाद—त्र्यं. सी. कारखानीस—'नवभारत' जनवरी १९५१
६०. केशवसुत (काहीं विचार)—प्रा. वा. ल. कुलकर्णी—'साहित्य' अक्टूबर १९४७
६१. कविश्रेष्ठ केशवसुत—मनोहर देशपांडे 'रोहिणी' अप्रैल १९४९
६२. पुन्हा केशवसुत—वसंत कानेटकर—'साहित्य' मई १९५०
६३. केशवसुत आणि तांबे—श्री. के. क्षीरसागर—'साहित्य' जुलाई १९५०
६४. केशवसुतांचा निसर्गविषयक रहस्यवाद—के. मा. आराध्ये—'युगवाणी' जुलाई, अगस्त १९४८
६५. केशवसुत आणि सामाजिक क्रांति—'नाथमाधव', 'वाङ्‌मयशोभा' फरवरी १९५१
६६. केशवसुतांच्या अेका कवितेचा अितिहास—श्री. बा. रानडे—'सत्यकथा' अक्टूबर १९५३
६७. केशवसुतांचा व्यक्तिवाद आणि वास्तवाधिष्ठित ध्येयवाद—रा. शं. वाळिंबे 'लोकमान्य' दिवाली अंक १९५४
६८. केशवसुतांची स्वप्नसृष्टि—श्रीराम अत्तरदे—'युगवाणी' अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर १९४७, फरवरी—अप्रैल—मई १९४८

६९. युगप्रवर्तक केशवसुत स्मृतिदिना निमित्तानें—शिरीष अत्रे—नवयुग १३-११-५५
७१. केशवसुत आणि मराठी काव्यांची ५० वर्षे—म. प्र. मोहरीर 'यशवंत' नवम्बर १९५५
७२. केशवसुतांचा पुरोगामी दृष्टिकोन—आ. सी. शेटये—'दैनिक लोकमान्य' १३-११-५५
७३. केशवसुत—रा. श्री. वैद्य—'दैनिक नवशक्ति' ७-११-५५
७४. केशवसुतांची तुतारी—(टिपणें)—गं. बा. ग्रामोपाध्ये 'छंद' सितम्बर, अक्टूबर १९५५
७५. केशवसुत—काव्य चर्चा—जुलाई, सितम्बर, अक्टूबर 'अुषा' वर्ष ३
७६. कविश्रेष्ठ केशवसुत—मनोहर देशपांडे, रोहिणी अप्रैल १९४९
७७. बंडवाला कवि—द. दा. जवारकर, रोहिणी मार्च १९५५

কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের সৌজন্যে নীচের গ্রন্থগুলি পাওয়া যায়। বইগুলি বর্তমান গ্রন্থরচনায় বিশেষ সহায়তা করেছে।

१. समग्र केशवसुत : सम्पादक : प्रो० भ. श्री. पंडित, प्रकाशक : वीनस प्रकाशन, पूना, मार्च १९१८
२. केशवसुत : रामचन्द्र श्रीपाद जोग, प्रकाशक : केशव भिकाजी ढवले, बम्बई-२, १९४७
३. केशवसुत, काव्य आणि कला : सम्पादक : वि. स. खांडेकर, देशमुख आणि कम्पनी, २२ कस्बा, पूना २, १९५६
४. झपूर्झा : सम्पादक : प्रो० वि. म. कुलकर्णी एवं प्रो० गो. म. कुलकर्णी ; प्रकाशक : विदर्भ मराठवाडा बुक कंपनी, पूना-२, १९६३ ।

কৃতজ্ঞতা

१. मराठी में रेडियो भाषण : आ. रा. देशपांडे का केशवसुत की प्रेम कविता तथा आध्यात्मिक कविता पर ।
२. राष्ट्रवाणी, पूना, मार्च-अप्रैल १९६६, केशवसुत पर हिन्दी में विशेषांक ।
३. स्वर्गीया कुसुमावती देशपाण्डे की 'मराठी साहित्य का इतिहास' नामक अंग्रेजी पाण्डुलिपि ।